ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

দাম : ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ১১ সংখ্যা ।। ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২৯ নভেম্বর ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

মুসলিম দুনিয়ার ষড়যন্ত্রের জালে কাশ্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের পাশে গোটা মুসলিম দুনিয়ার থাকাটা নতুন কোনও ঘটনা নয়। তবে টিন ইদানীংকালে যেভাবে বারংবার সীমা লঙ্ঘন করে ভারত-পাকিস্তানের 'কাশ্মীর সম্পর্ক' নিয়ে অবাঞ্ছিতভাবে মাথা গলিয়েছে, সেইসঙ্গে ইরানও তার সাম্প্রতিকতম বক্তব্যে কাশ্মীরের সঙ্গে যেভাবে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাকের 'নিপীড়িত মুসলমান'দের পাশে ইসলামিক দুনিয়াকে থাকার আবেদন জানিয়েছে, তাতে

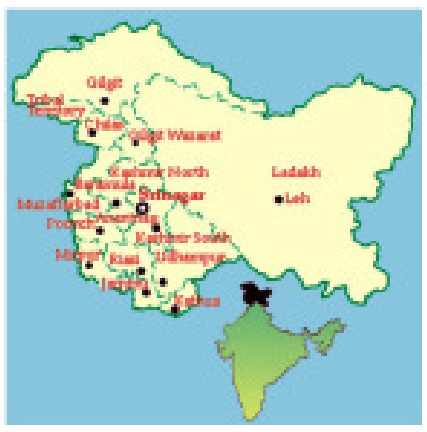

প্রমাণ হচ্ছে মুসলিম দুনিয়া-কৃত আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের 'রোডম্যাপে' ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরাজ্য কাশ্মীর ঢুকে পড়েছে অচিরেই। তেহরানে হজযাত্রীদের একটি সভায় ইরানের প্রধান নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনী বলেছেন, ''আজকের দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে সম্ভ্রান্ত ইসলামিক উম্মাহ্ (কট্টরপন্থী ইসলামিক পন্ডিত সভা)-গুলোর প্রধান কর্তব্য প্যালেস্টাইন ও সেইসঙ্গে গাজা ভূ-খণ্ডে অবরোধকারী মানুষজনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। যাতে করে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক এবং কাশ্মীরী জনতা যাঁরা মার্কিন ও ইহুদি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন, তাঁদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায় যে তাদের আন্দোলনের প্রতি আমরা (পড়ুন মুসলিম দুনিয়া) সহানুভূতিশীল এবং এই আন্দোলনে সহায়তা করতে প্রস্তুত।''

আয়াতোল্লা-র এহেন মন্তব্যে, দেশের কূটনৈতিক মহল প্রমাদ গুণছেন। তাঁদের বক্তব্য, আয়াতোল্লা তাঁর বক্তব্যে কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারতকে ইচ্ছাকৃত-ভাবে টেনে না এনে মার্কিন ও ইহুদী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরব হয়ে 'কাশ্মীর'কে আন্তর্জাতিক মাত্রা দেবার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানও ব্যাপারটায় তাই চায়। পাক-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের মাত্রা বাড়তেই তাই টিন এ-প্রসঙ্গে মাথা গলিয়ে একে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছিল।

ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতও। সেদেশের ভারতীয় দূতাবাসকে গত ১৯ নভেম্বরই এব্যাপারে সরকারি প্রতিবাদ নথিভুক্ত করতে বলেছিল নয়াদিল্লী। পরে ইরানের ভারপ্রাপ্ত বিদেশসচিব রেজা আলাই-কে ভারত জানিয়েছে আয়াতোল্লার বক্তব্য 'গভীর হতাশাজনক' এবং 'দেশের সংহতি এবং সার্বভৌমত্বে'র প্রশ্নে 'গভীর সংকট' সৃষ্টি করবে। ইরানের কাছে এব্যাপারে 'রাজনৈতিক ক্ষমাপ্রার্থনা-র' ও দাবি করেছে সাউথ ব্লক।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইদানীংকালে

(এরপর ৪ পাতায়)

কাশ্মীরে বসেই মুম্বাইয়ে আবার ২৬/১১-র ছক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। একদিকে ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীর নিয়ে যখন চেষ্টানো হচ্ছে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের জাল, ঠিক তখন-ই ভারতে সন্ত্রাসবাদী হানার পরিকল্পনা করতে কাশ্মীরের মাটিকেই ব্যবহার করল ষড়যন্ত্রীরা। গোয়েন্দাসূত্রের খবর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী-ই পাক-পন্থী তিনটি জঙ্গি সংগঠন লস্কর-এ-তৈবা, হরকত-উল-মুজাহিদিন এবং ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সাত জঙ্গি ইতিমধ্যেই ঘাঁটি গেড়েছে মুম্বাই-এ। ২৬/১১-এর কৌশলেই একটি পাঁচতারা হোটেলে খুব শীঘ্রই নাশকতা চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের মাথায়। এদেশের গোয়েন্দাবাহিনীর এক আধিকারিক জানালেন, ''এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে যেটুকু খবর এসেছে তার ওপর ভিত্তি করে ধরে নেওয়া যেতে পারে লস্কর-এ-তৈবা এবং হরকত-উল-মুজাহিদিন— এই দু'টি জঙ্গি সংগঠনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে যে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় তার অকুস্থল ছিল কাশ্মীর এবং সেই বৈঠকে সম্ভবত ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিগোষ্ঠীর কম্যান্ডাররাও উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকেই সন্ত্রাসবাদীদের বাছাই করা হয় এবং পরিকল্পনামাফিক-ই নাশকতা চালানোর জায়গায় দ্রুত তাদের পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়।''

গোয়েন্দা-সূত্র এও জানাচ্ছে যে, পরিকল্পনা মাফিক ওই তিনটি জঙ্গি সংগঠনের বাছাই করা সাত জঙ্গি ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে মুম্বাই-তে। তবে তাদের

পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা ?

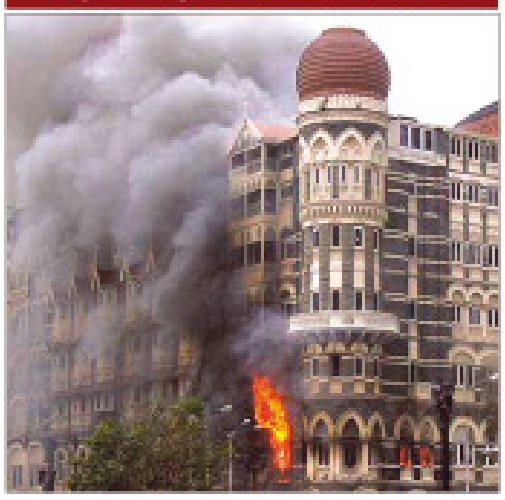

সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য গোয়েন্দা-বাহিনীর হাতে আপাতত না এলেও, ২৬/১১-এর মতো নাশকতা ঠেকাতে পাঁচ-তারা হোটেলগুলো-তে তো বটেই, গোটা শহর জুড়েই নিরাপত্তা-ব্যবস্থা আঁটোসাটো করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনী এব্যাপারে তাদের হাতে থাকা বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে সতর্ক করে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছে মুম্বাই পুলিশকে। সেইমতো গোটা মহারাষ্ট্র জুড়ে সমস্ত থানা, অপরাধ দমন শাখা, অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদেরও সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে গোয়েন্দাদের তরফে।

পরিস্থিতি যা তাতে কেন্দ্রের অবস্থাটা 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'-এর মতো হয়েছে। কাশ্মীরের ওপর এই মুহূর্তে কেন্দ্রের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ভারতবর্ষের মানুষের ভূ-স্বর্গ কেন্দ্রীয় সরকারের দৌলতে সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গে (অর্থাৎ নিরাপদ আশ্রয়ে) পরিণত হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর সরকারের অবস্থাও তথৈবচ। তারা প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক; দ্বিতীয়ত, সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ক্ষমতার দৌড়ে বিরোধী পি ডি পি নেত্রী মেহবুবা মুফতির সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী তোষণ প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। কাশ্মীরে ওমরের জোটসঙ্গী ও কেন্দ্রের প্রধান শাসকদল কংগ্রেস, তাই তাদের নাকের ডগাতেই কাশ্মীরে বসে ভারতে নাশকতা চালানোর ছক তৈরি হচ্ছে জেনেও ক্ষমতায় টিকে থাকার তাগিদে নিশ্চুপ রইলো। আর এখন কংগ্রেসী সরকার, সন্ত্রাসবাদীরা তাদের লক্ষ্যনীয় গন্তব্যে পৌঁছে যাবার পর এনিয়ে প্রতিরোধী-ব্যবস্থা নিচ্ছে। তবে এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হবে তা নিয়ে নিরাপত্তা-কর্মীদের একাংশে-ই যথেষ্ট

(এরপর ৪ পাতায়)

দেগঙ্গার হামলাকে কেন্দ্র করে আবার দেশভাগের উস্কানি

জিয়াউল মণ্ডলের উস্কানিমূলক প্রবন্ধ।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গার টাকী রোড সংলগ্ন একটি দুর্গাপূজার মণ্ডপ নির্মাণকে কেন্দ্র করে গত ৬-৮ সেপ্টেম্বরে এক তরফাভাবে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনার কথা এখন আর অবিদিত নেই। আর হিন্দুদের উপর এই হামলার নাটের গুরু যে বসিরহাটের সাংসদ হাজী নুরুল ইসলাম— এই অভিযোগও উঠেছে। এই হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে দেগঙ্গা অঞ্চলের ৩২টি পূজা কমিটি এবছর দুর্গাপুজো করেনি। উল্লেখ্য, দেগঙ্গা অঞ্চলে হিন্দুদের সংখ্যা মাত্র ৩০ শতাংশ। এখানে হিন্দুরা তাদের ধন-প্রাণ-মান বাঁচাতে যখন আতঙ্কবোধ করছে, তখন একশ্রেণীর মুসলিম পত্র-পত্রিকা 'ভারত আর একবার স্বাধীন করতে হবে' বলে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আবার ভারত ভাগ করতে উস্কানি দিচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে কেষ্টকে পাড়া থেকে আব্দুল মতিন সম্পাদিত পাক্ষিক 'বঙ্গনূর' পত্রিকার একাদশ (আশ্বিন ১৬-৩০, ১৪১৭) সংখ্যায় জনৈক জিয়াউল মণ্ডলের 'ভারত আর একবার স্বাধীন করতে হবে' এই শিরোনামে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত সূত্র অনুসারে পত্রিকাটি কেবল মসজিদ, মাদ্রাসা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এই নিবন্ধে বলা হয়েছে— ''ইংরেজ সরকার

(এরপর ৪ পাতায়)

মুসলিম তোষণ নীতির ভবিতব্য আর কতদিন ?

গুরুপুরুষ।। বিহার রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনপর্ব শেষ। এবার পশ্চিমবঙ্গের পালা। যদিও তার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকে অপেক্ষা করতে হবে কমপক্ষে আরও পাঁচ মাস। কিন্তু সিপিএম-কৃণমূল নেতাদের বাকযুদ্ধ প্রতিদিন যেভাবে চলছে তাতে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন একেবারে দোরগোড়ায় এসে গেছে। নির্বাচনী প্রচারের ডাকে কাঠি পড়েছে। আর এই ডাকের বাদ্যির সঙ্গে কাঁসির শব্দের মতো প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির তাল ঠোকা চলছে। কলকাতায় যাঁরা বাস করেন অথবা কর্মসূত্রে যাতায়াত করেন তাঁরা জানেন, মহালয়ার পরেই ঢাকিরা গ্রাম থেকে এসে যান। তাঁদের উপস্থিতি জানান দেয় ঢাকের এবং কাঁসরের বাজনা। কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও কলকাতাবাসী টের পান মা আসছেন।

(এরপর ৪ পাতায়)

'দেগঙ্গা' এবার জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গার ৬-৮ সেপ্টেম্বর উঠে এল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগরে গত ১৭-১৮ নভেম্বর, দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায়। গত ৬ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর দেগঙ্গায় সাম্প্রদায়িক মুসলিমরা স্থানীয় সাংসদের নেতৃত্বে লাগাতার দু'দিন ধরে তাণ্ডব চালায় হিন্দুদের ওপর। যার বিবরণ এবছরের স্বস্তিকার ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০ সেপ্টেম্বর, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এবার দু'টি ভিন্ন ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনার সাক্ষী থাকল জয়নগরের পাতপুকুর ও চুনারপুকুর গ্রামের গ্রামবাসীরা এবং বৈদ্যচক সারদা পাড়ার মানুষজন। গত ১৮ নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসানের দিন জয়নগর থানার অন্তর্গত পাতপুকুর এবং চুনারপুকুর গ্রামের বাসিন্দারা স্থানীয় ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসানের মিছিলে 'কৃষ্ণে অষ্টশতনাম' সংকীর্তন করতে করতে পথ-পরিক্রমা করছিলেন। বৈদ্যচক মোড়ের কাছে তাঁরা এসে পৌঁছলে কয়েকজন মুসলিম যুবক (স্থানীয় সূত্র যাদেরকে 'দুষ্কৃতী' আখ্যা দিচ্ছে) পথরোধ করে দাঁড়ায়। প্রথমে গান বন্ধ করার হুমকি, তারপর কথা-কাটাকাটি এবং শেষে বাঁশ লাঠি ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা ভাসান দিতে আসা হিন্দু জনতার ওপর। রেয়াত করা হয়নি মহিলাদেরও। তাঁদের সম্মানহানি করার চেষ্টা করে কিছু মুসলিম যুবক। কয়েকজন হিন্দু যুবক এনিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে তাদেরকেও বেধড়ক মারধোর করা হয়। স্থানীয় থানা গোটা

বৈদ্যচকের এই মন্দিরেই ছোড়া হয়েছিল গো-মাংস।

ব্যাপারটাতেই নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পরে এনিয়ে পুলিশ কোনও মন্তব্যও করতে চায়নি।

বৈদ্যচকেই সরদার পাড়ায় গত ১৭ নভেম্বর আরেকটি পৃথক ঘটনায় স্থানীয় মন্দিরের মধ্যে মুসলিম দুষ্কৃতীরা গোরুর মাংস ছুঁড়ে নিয়ে অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা করে। মন্দিরের সেবিকা স্থানীয় বাসিন্দা

(এরপর ৪ পাতায়)

বিদায় আসন্ন জেনেই এরাজ্যকে দেউলিয়া বানাচ্ছে সি পি এম

তারক সাহা।। বিড়ম্বনা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না সিপিএমের। গত ১১ নভেম্বর দলের ৪৪ জন নেতা-কর্মীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষিত হলো এক দশক আগে নানুর গণহত্যার দায়ে। আর এর ঠিক একদিন বাদেই রাজ্যপাল রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে তলব করলেন রাজ্যের বেহাল আর্থিক দশা দেখে। এমন ঘটনা সারাদেশে তো বটেই, এরাজ্যেও নজীরবিহীন। মাঝে মাঝেই এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় রাজ্যপাল হস্তক্ষেপ করলেই বামেরা সাধারণত হৈ হৈ করে ওঠে। যতদিন কেন্দ্রে 'বন্ধু সরকার' থেকেছে বামেরা তাদের মনপসন্দ রাজ্যপাল পেয়ে এসেছে। কার্যতঃ এইসব রাজ্যপালেরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্বোধনের মধ্যেই তাঁদের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ রাখতেন। ব্যতিক্রম যে ঘটেনি এমন নয়। আশির দশকে ইন্দিরা স্তাবক প্রয়াত অনন্তলাল শর্মা তো কার্যতঃ পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করেছেন বামেদের সঙ্গে। সাম্প্রতিককালে ইউ পি এ সরকার থেকে বামেদের সমর্থন তুলে নেওয়ায় বেজায় চটেছেন সোনিয়া। এরমধ্যে ঘটে গেছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনাবলী। রাজ্যে হিংসা নিয়ে সরব হয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। প্রচুর গঞ্জনা সয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য আর রাজ্যপাল হতে চাননি তিনি। সোনিয়া তাই প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও দুঁদে আমলা এম কে নারায়ণনকে রাজ্যপাল করে পাঠিয়েছেন তাঁর অবসরের অব্যবহিত পরেই।

এহেন কর্তাভজা রাজ্যপাল যে সরকারের বিরোধী হবেন তা বলাই বাহুল্য। আর এমনই এক আর্থিক সঙ্কট মুহূর্তে অর্থমন্ত্রীকে তলব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আর্থিক সঙ্কট নিয়ে কী আলোচনা হলো রাজ্যপালের সঙ্গে তা বিশদে জানা না গেলেও এটা জানা গেছে যে, শতকরা ৮ শতাংশ হারে সরকার বাজার থেকে ৫০০ কোটি টাকা ধার নিচ্ছে দৈনিক খরচ মেটাতে। ইদানিংকালে দুটো জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটি হলো— যে কোনও পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিষয় গুজরাট, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যকে এক মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়। আবার, অপরাধ, আর্থিক অবস্থার বেহাল দশা প্রভৃতির ক্ষেত্রে আরেকটি মানদণ্ড হিসেবে বিহার, উত্তরপ্রদেশের নিরীখে তুলনা করা হয়। এমনসব ক্ষেত্রে দেখা যায় উন্নয়নের খতিয়ানে এ বাংলার দশা একেবারে নীচের দিকে। আবার খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই রাজ্যের ঠাঁই বিহারের পাশেই।

সম্প্রতি একটা পরিসংখ্যানে এমনই দশা দেখা যাচ্ছে। ২০০৮-'০৯-র আর্থিক বছরের নিরীখে দেশে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে এরাজ্যের অবস্থাটা কীরকম রাজ্যের ঋণ ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তারই হিসেব দেওয়া হলো। (রাজ্যের গড় উৎপাদনের শতকরা হিসেবে।)

রাজ্যসমূহ	ঋণ	রাজস্ব
বিহার	৪৯.২	৫.৫
পশ্চিমবঙ্গ	৪৩.২	৪.৭
অন্ধ্র	৩০.০	৯.৬
গুজরাট	৩০.০	৬.৭
মহারাষ্ট্র	২৬.১	৭.২
কর্ণাটক	২৫.৫	১০.৭

ওপরের হিসেব থেকে দুটো জিনিস লক্ষণীয়। সেটা হলো ঋণ নেওয়া ও রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিচারে সবার ওপরে রয়েছে কর্ণাটক (সারণী অনুযায়ী সবার নীচে)। রাজস্ব আদায়ের যে ধারা কর্ণাটকে অব্যাহত তার অন্যতম কারণ হলো ওই রাজ্যের অগ্রগতি। অর্থাৎ রাজস্ব আদায় সেই রাজ্যেরই বেশি যে রাজ্যে শিল্প গড়ে উঠছে, কৃষিও সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে। রাজস্ব আদায় ভাল বলেই সে রাজ্যে ঋণ নেওয়ার প্রবণতাও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। উল্টোদিকের বিচারে ৩৪ বছরের বাম জমানায় রাজ্যের পরিস্থিতি যে তলানিতে ঠেকেছে তার অন্যতম কারণ হলো অনগ্রসরতা। এরাজ্যবাসী হিসেবে ভাবতে লজ্জাবোধ হয় যখন দেখি গড় উৎপাদনের নিরীখে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও বিহারের নীচে এই রাজ্য এবং ঋণ গ্রহীতা হিসেবে এই রাজ্য দ্বিতীয়স্থানে (সারণি দ্রষ্টব্য)।

রাজ্যের অবস্থা এমন কেন? এই সঙ্কট কাটাতে সরকার কী কী ব্যবস্থা নিল? মহাকরণ সূত্রের খবর— সরকার ওভার ড্রাফট নিয়েছে ৮০০ কোটি টাকা আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলছে ২০১০-র ১৩ এপ্রিলের পর সরকার ও তার এজেন্সী বাজার থেকে ৯,৫০০ কোটি টাকা ধার নিয়েছে যা দেশের যে কোনও রাজ্যের থেকে যথেষ্ট অধিক। সেই সূত্রের বক্তব্য হলো এমন ধারা চলতে থাকলে অচিরেই রাজ্য দেউলিয়া হয়ে পড়বে। সময়মত টাকা না পেলে বিভিন্ন সরকারী কাজের ঠিকাদার ও সরবরাহকারীরা কাজ ও সামগ্রী সরবরাহ বন্ধ করে দেবে— এমনটাই বলছে তারা। ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের হিসেব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, রাজ্যের বাজেটের ৪৭ শতাংশ ঋণ নেওয়া হয়েছে ২০০৫ এবং ২০০৮-র মধ্যে।

সমীক্ষা বলছে যে, সরকারী আয়ের ৩০ শতাংশ অর্থ ব্যয় হচ্ছে ঋণের সুদ গুণতে। আবার সরকার যে ঋণ নিয়েছে তা পরিশোধের সময়সীমা হলো ২০১২-১৩তে। তাহলে কি বলা যাবে এই ঋণ পরিশোধের দায় বর্তাবে ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সরকারের ওপর?

নির্বাচনে বামেদের পরাজয় আসন্ন এটা রাজ্যের সব মহলই বলছে। এই আশঙ্কায় ভুগছে বাম নেতারা সবাই। আর রাজ্যবাসীদের তোয়াজ করতে ১ লক্ষ ২০ হাজার কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে বুদ্ধ সরকার স্কুলে, কলেজ সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত পুরসভায়। রাজ্যের বর্তমান প্রায় ১০ লক্ষ কর্মচারী এবং ৪ লক্ষ পেনশন ভোগীদের মহার্ঘভাতা দেদার বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকার বলছে ৭০০০ কোটি টাকার মতো কেন্দ্রের কাছে পাবে সরকার। ১ শতাংশ মূল্যযুক্ত কর বাড়িয়েছেন অসীমবাবু ব্যাবহৃত দ্রব্যের ওপর। তাঁর মতে কেন্দ্রের ৭০০০ কোটি টাকা রাজ্য পেলে অনেকটাই সামলে যাবে বর্তমান পরিস্থিতি।

তবে কি এই আর্থিক অবস্থা বামেদের সুকৌশল নীতি— ২০১১ সালের নতুন সরকারকে বেকায়দায় ফেলার? রাজনৈতিক মহলের ধারণা যে এটা আসলে ছলে-বলে-কৌশলে মমতাকে বিপাকে ফেলার চক্রান্ত। ২০১২-১৩ সালে যে বিপুল অর্থ পরিশোধ করতে হবে নতুন সরকারকে তার সংস্থান হবে কীভাবে? ঠিকাদাররা পয়সা না পেলে বা বিলম্ব হলে সবরকম কাজ বা সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে অপদস্থ হবে নতুন সরকার। আর এমন অবস্থা হলে বামেরা নতুন করে অক্সিজেন পাবে বেঁচে ওঠার। ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে মমতাকেও বামপন্থীদের রাস্তায় হাঁটতে হবে। উদ্বৃত্ত কর্মী যে সব সরকারী সংস্থায় রয়েছে তাদের ছাঁটাই করতে পারবেন না। পারবেন না যোজনা-বহির্ভূত ব্যয় সংকোচন করতে বা মুদ্রাস্ফীতিজনিত বাড়তি খরচ-ই বা কীভাবে কমাবেন মমতা? ২০১১-র নির্বাচন আর কেবল কয়েকমাসের অপেক্ষা, অভূতপূর্ব এমন বেহাল রাজ্যের আর্থিক দশা মমতা কী লাওয়াই দিয়ে সারাবেন আগামীদিনে সেটারই অপেক্ষায় রইলো রাজ্যবাসী।

এই সময়

সন্ত্রাসের রাজনীতি

সন্ত্রাসবাদ, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিষয়টা এতদিন কূটনৈতিক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মুসলিম দুনিয়া বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাস আমদানীর প্রশ্নে এককাট্টা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কূটনীতির আঙিনা থেকে বেরিয়ে সন্ত্রাসবাদ এখন বিশ্ব-রাজনীতির পরিসরে এসে পড়েছে। বালুচিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে আমেরিকার ক্রমাগত আক্রমণ শানানোর দাবীকে এককথায় খারিজ করে দিয়েছে পাক-সরকার। ইতিপূর্বে কোয়েটাতে মার্কিন সৈন্য-সমাবেশের প্রতি পাক-সহানুভূতি থাকলেও বর্তমানে 'সার্বভৌম ক্ষমতার সঙ্গে আপোষ না করা'র অজুহাতে এর বিরোধী হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, কাশ্মীর ইস্যু-র পরিপ্রেক্ষিতে কূটনৈতিক ও কৌশলগত কারণে পাকিস্তান এতকাল আমেরিকার পাশে থাকলেও, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে ইসলামিক দুনিয়া এক হওয়ার ফলে আপাতত আমেরিকার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেই চলবে ইসলামাবাদ। সুতরাং বিশ্বজুড়ে প্রবহমান সন্ত্রাসবাদে পাক-মদতদান এবার আরও প্রত্যক্ষরূপে রূপায়িত হচ্ছে।

বৃটেনে শরিয়তী শিক্ষা

সম্প্রতি বিবিসি প্রদত্ত একটি তথ্য অনুযায়ী —পড়াশুনা নয়, বৃটেনে একটি ইসলামী স্কুলে এবার ছাত্রদের শেখানো হচ্ছে দোষীদের শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতি। ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে শরিয়তী আইন মেনে শাস্তিদানের একটি পাঠ্যপুস্তকও। পুস্তকটিতে দেওয়া আছে অভিনব ও নৃশংস শাস্তি দানের পদ্ধতি। যেমন— যারা চোর, প্রথম অপরাধ হলে তাদের শাস্তি হিসেবে কাটা হবে তাদের হাত এবং পরবর্তীকালে একই 'দোষ' করলে কেটে ফেলা হবে তাদের পা-ও। সমকামীদের জন্য পাথর ছুঁড়ে মারা বা আগুনে পুড়িয়ে মারার কথাও রয়েছে পাঠ্যপুস্তকটিতে।

ভারতের সেঞ্চুরী

সম্প্রতি একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, সিগারেটের বাক্সের গায়ে চিত্র-সতর্কীকরণের নিরীখে গোটা বিশ্বের ১৭৫টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান শততম। এই ক্ষেত্রে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, থাইল্যাণ্ড ও মালদ্বীপের মতো দেশগুলির স্থানও ভারতের উপরে।

গত সপ্তাহে উরুগুয়েতে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশান অন টোবাকো কন্ট্রোলের-(এফ সি টি সি) একটি সমাবেশে 'দ্য সিগারেট প্যাকেজ হেলথ ওয়ার্নিং ইন্টারন্যাশানালে'র স্টেটাস রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের ৩৯টি দেশ তাদের সিগারেটের বাক্সের উপর চিত্র-সতর্কীকরণের প্রয়োগ করছে। অধিকাংশ দেশই এই ব্যাপারে খুব শীঘ্রই যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। দ্য গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোবাকো সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া রিপোর্ট ২০১০ অনুযায়ী— এদেশে সাম্প্রতিক সময় প্রায় ৫.৭ শতাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষই ধূমপান করেন। এরপরেও ঘুম ভাঙেনি পরিবেশ-মন্ত্রকের। ভারতে দৈনিক ২৫০০ মানুষের মৃত্যু ঘটে ধূমপানের কারণে অথচ আগামী ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত সিগারেটের বাক্সের উপর চিত্রসতর্কীকরণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত। প্রসঙ্গত, গত মার্চে বিষয়টি গৃহীত হবার পর ১ জুন থেকে এই চিত্রসতর্কীকরণ দেবার কথা ছিল। কিন্তু সময়সীমা আরও ছ'মাস বাড়িয়ে তা ১লা ডিসেম্বর করা হয়েছিল।

ক্যান্সার রোধে

এবার আপনার দৈনিক খাদ্য তালিকায় সংযোজন করে নিন তাজা ফলমূল। কারণ, প্রত্যহ নানাবিধ ফলমূল আহারের ফলেই ফুসফুস ক্যান্সারের আশঙ্কা ২৩ শতাংশ অবধি কমতে পারে। সম্প্রতি, পরীক্ষা- নিরীক্ষার পরে একথাই জানিয়েছেন ১০টি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের গবেষকমহল। তাই শরীরকে সুস্থ রাখতে ও নিজেদের এই মারণ রোগের হাত থেকে বাঁচাতে আজ থেকেই শুরু করুন ফলমূল খাওয়া!

২৫ লক্ষ বছরের পুরনো

প্লিসটোসীন যুগের একটি প্রস্তরীভূত হওয়া তামাক। বয়স প্রায় ২.৫ মিলিয়ান বছর (ভারতের হিসেবে ২৫ লক্ষ বছর)। সম্প্রতি, পেরুর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মারানোন নদীর অববাহিকায় মেয়ার হেনিনজার প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালার গবেষকদের তামাকটি চোখে পড়ায় একথাই জানান তাঁরা। তামাকটির ঘনবিশিষ্ট ব্লকটির আয়তন প্রায় ৩০ স্কোয়ার সেন্টিমিটার। পেরুর প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা আমাজন নদীর উত্তর দিক থেকে উদ্ধার করেন তামাকটি। তবে সেই তামাকটির প্রকৃত বয়স কত তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকেই গেছে।

হাসিনার আইন

দক্ষিণ-এশিয়ায় বাঘসহ বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের নির্মম হত্যালীলা বন্ধ করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিল বাংলাদেশ সরকার। এনিয়ে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করতে চলেছে তারা। আইন অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বাঘ বা অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারকে হত্যা করেন তাহলে, শাস্তিবাবদ প্রায় ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে হত্যাকারীকে দণ্ডিত করা হবে। গত ২১ নভেম্বর বাংলাদেশের সরকারি সূত্রে এই কথা জানানো হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মন্ত্রিসভার একটি সমাবেশে জানান জন্তুজানোয়ারদের দ্বারা যারা আক্রান্ত হয়েছেন বা মারা গেছেন, তারা বা তাদের পরিবারবর্গকে বাংলাদেশের আর্থিকমূল্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ হাজার টাকা থেকে ১৪১৫ ডলার (ভারতীয় মূল্যে ১ লক্ষ টাকা)-এর মধ্যে একটি মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

আয়ু নির্ণয়ে গোলযোগ

এবার বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মণ্ডলীর মতবাদের দিকে আঙুল তুললেন অন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী। মানুষের জিনোমস্ পরীক্ষা করে তার জীবদ্দশা (আয়ু) সম্পর্কে প্রায় ৭৭ শতাংশ নির্ণয় করা সম্ভব বলে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকমহল ইতিপূর্বেই জানিয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তাদের এই মতবাদকে ত্রুটিপূর্ণ বলে দাবি জানান কয়েকজন বিজ্ঞানী। মানুষের আয়ু নির্ণয় করার পরীক্ষাটি সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তারা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ফ্যাসিবাদী কংগ্রেস সরকার

সনিয়া-চালিত কংগ্রেস দল নেতৃত্বাধীন মনমোহন সিং সরকার গত কয়েক মাস যাবৎ সমস্ত সমস্যার সমাধানে একটি অধৈর্য্যপনা দেখাইতেছে। ইহা নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি। দুর্নীতি আর কলঙ্কের হাত হইতে বাঁচিতে কখনও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদিগের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে, কখনও কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেলের উপর রোশ প্রকাশ করিতেছে, কখনও বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের উপর অনাস্থা প্রকাশ করিতেছে। যখনই কোনও মন্ত্রী বা আমলা দুর্নীতিতে কলঙ্কিত হইয়া পড়িতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের কোনও নেতা বা তাহাদের রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সি বি আই কিংবা এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বাহিনীকে লেলাইয়া দেওয়া হইতেছে। কখনও বা বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের প্রতিভূ ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে আড়াল করিতে শান্তির চির প্রতীক গেরুয়া রংয়ের উপর কলঙ্ক লেপন করিতে উদ্যত হইতেছেন তাঁহারা।

২০০৪ সালে ক্ষমতা হাতে পাইয়াই সনিয়ার কংগ্রেস দল গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও নিরপেক্ষতাকে ধ্বংস করিয়া সি বি আই-কে পায়ের ভৃত্যে পরিণত করিয়াছে। ঠিক নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে, সে কোনও রাজ্যেরই হউক কিংবা কেন্দ্রেরই হউক, বিজেপি শাসিত কোনও না কোনও রাজ্যের বিরুদ্ধে অথবা তাহাদের নেতাদের বিরুদ্ধে অযোধ্যা বা গুজরাট দাঙ্গার চার্জশিট, শুনানী, জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করানো হয় সি বি আইয়ের সাহায্যে।

সি বি আই-এর পর কংগ্রেস সরকার সুপ্রিম কোর্টের কণ্ঠরোধ করিতেও উদ্যোগ লইয়াছে। সুপ্রিম কোর্টকে কব্জা করার সহজ পথ বিচারপতিদের চরিত্র হনন করা। সি বি আই-কে দিয়া ঠিক সেই কাজটিই করানো হইয়াছিল গত জুলাইয়ে ছয়জন বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নয়ছয় করার সম্বন্ধে একটি হলফনামা পেশ করিয়া।

সুপ্রিম কোর্টের কণ্ঠ যে ইহাতে রোধ করা যায় নাই তাহার প্রমাণ খাদ্যশস্য বিনামূল্যে বিতরণ করার নিমিত্তে ১২ আগস্টের নির্দেশ। এই সংবাদে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে দেশের মানুষ যখন অন্নাভাবে মরিতেছে তখন সরকারী গুদামে পড়িয়া পচিতেছে লক্ষাধিক টন খাদ্যশস্য। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি খুব স্বাভাবিকভাবেই মানবিকতার টানে এই নষ্ট হইতে বসা লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য গরীবদের মধ্যে বিলি বন্টন করিবার নির্দেশ দেন। তাহাতেই কংগ্রেসের অন্তরাত্মার নির্দেশে মনমোহনজী সুপ্রিম কোর্টের মুন্ডপাত করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রসাদ পাওয়া এক কমিউনিস্ট নেতা, যিনি চিরকাল আইন-ব্যবসা করিয়াই পেট ভরাইয়াছেন, তিনিও সুপ্রিম কোর্টের মুন্ডপাত করিতে কসুর করেন নাই। যদি ভারতের রাষ্ট্রদূতের পদটি কোথাও না কোথাও পাওয়া যায়! আদালতের হাতে হাতকড়া পরাইবার ইচ্ছাও সরকারের আছে বলিয়া শোনা যাইতেছে!

কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্টকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করা যাইতেছে না। পুনরায় সুপ্রিম কোর্ট গত মাসেই মন্তব্য করিয়াছেন যে দুর্নীতি রোধে সরকারের একেবারেই গা নাই। ইনকাম ট্যাক্স, সেল্‌স্ ট্যাক্স এবং এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টগুলিতে চলিতেছে অবাধ দুর্নীতি। বিরক্ত হইয়া বিচারপতিগণ এও বলেন যে এর চেয়ে বরং সরকারের উচিৎ ঘুষ আইনসঙ্গত করিয়া দেওয়া। ঘুষের টাকা বাঁধিয়া দেওয়া, তাহাতে অন্ততঃ ফাইল নড়িবে তাড়াতাড়ি! টেলিকম মন্ত্রী এরাজার ২-জি স্পেকট্রাম বিলি সংক্রান্ত মামলাতেও সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক মন্তব্যে প্রধানমন্ত্রী খুবই খেপিয়া উঠিয়াছেন।

গত কয়েক মাস যাবৎ কংগ্রেস সরকার নানান অজুহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডানা ছাঁটিবার পরিকল্পনা করিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাথার উপরে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে ফাইনান্সিয়াল স্টেবিলিটি এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল-কে, যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোনও সদস্যকেই রাখা হয় নাই। পুরো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে অর্থমন্ত্রীকে, ইহার চেয়ারম্যান হিসাবে। ব্যাঙ্কের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহা ছাড়াও সিকিউরিটিজ এ্যান্ড ইনস্যুরেন্স লজ (অ্যামেন্ডমেন্ট এ্যান্ড ভ্যালিডেশন) অ্যাক্ট, ২০১০ পাশ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। গঠন করা হইয়াছে সার্চ কমিটি; উদ্দেশ্য থোরাটের মতো কড়া ধাতের অফিসারদের সরানো এবং সরকারের আস্থাভাজন ইয়েসম্যান বসানো।

কংগ্রেস প্রধানের ঘনিষ্ঠ অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোর এই প্রক্রিয়ায় শুরু হইয়াছিল নবীন চাওলার মতো দুঁদে আমলাকে বিরোধী দলের লাগাতার আপত্তি সত্ত্বেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে বসানোর মধ্য দিয়া। এই প্রক্রিয়ারই নবতম সংযোজন টু জি স্পেকট্রাম দুর্নীতিতে অভিযুক্ত টেলিকম সচিব পি জে টমাসকে সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনার (সিভিলি) পদে বসানো।

দুর্নীতির পাহাড়ে বসিয়া থাকা কংগ্রেস দলের পক্ষে আজ আইনের শাসন অসহ্য। সর্বক্ষেত্রে ফ্যাসীবাদী নিয়ন্ত্রণ ছাড়া তাহার গতি নাই। অধৈর্য্য শাসকের ফ্যাসীবাদী হওয়াটা শুধুই সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমি এবিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় যে, স্বদেশী হোক, বিদেশী হোক প্রত্যেক গভর্নমেন্টের প্রধানতম রক্ষা কবচ হইল জনসাধারণের সন্তোষ, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা। অভিযোগ নিরাকৃত না করিয়া সাধারণের প্রীতি কেমন করিয়া অর্জন করা সম্ভব?

—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় স্থায়ী হওয়ার জন্যই 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা

বিষ্ণু গুপ্ত

জনমানসে যে কারও প্রতিচ্ছবি (ইমেজ) খারাপ করার জন্য ইচ্ছেমতো অভিযোগ চাপিয়ে দেওয়া, যা ইচ্ছে তথ্য পরিবেশন করার একচেটিয়া কারবার কি শুধুমাত্র একা কংগ্রেসেরই আছে? এরকম ঠিকেদারকে যদি কেউ কড়া ভাষায় একটু রঙ-চড়িয়ে মুখের মতো জবাব দেয় তা কংগ্রেস কি করে সহ্য করবে! কংগ্রেস তো কোনওরকম চিন্তা-ভাবনা আগে-পিছে না ভেবেই দেশের রাজনীতিকে সঙঘর্ষ এবং ঘৃণার পথে ঠেলে দিয়েছে। প্রাক্তন আর এস এস প্রধান কে এস সুদর্শনের 'সোনিয়া গান্ধী' সম্বন্ধে কড়া মন্তব্য-ই হোক কিংবা কংগ্রেসীদের পক্ষ থেকে আর এস এস-এর বিভিন্ন কার্যালয়ে হামলা চালানোর ঘটনাই হোক না কেন— এসবের পশ্চাৎপট কিন্তু সুনিয়োজিতভাবে কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙঘকে বদনাম করার কুটিল-নীতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে। যখন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে। বাস্তবে তারা আদৌ নিরপেক্ষ নয় অথবা চাপ ব্যতিরেকে কাজ করছে এমনও নয়। আসলে কংগ্রেস তার বিরোধীদের জব্দ করার জন্য প্রতিরক্ষা এবং তদন্ত সংস্থাগুলোকে দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করে থাকে।

সোনিয়া-সুদর্শন-সি আই এ

প্রাক্তন সরসঙঘচালক শ্রীসুদর্শনজীর অভিযোগ অত্যন্ত কঠোর হতেই পারে তবে তা যে এই প্রথমবারই উঠছে এমনটা কিন্তু নয়। এর আগেও সোনিয়া গান্ধীর উপর অনেক মারাত্মক অভিযোগ করা হয়েছে। যে সকল 'মহান লোকে'রা সুদর্শনজীর বিবৃতিকে এ ধরনের অভিযোগ প্রথমবার বলে ধরে নিচ্ছেন তাদেরকে 'পুরনো স্মৃতি' একটু ঝালিয়ে নিতে অনুরোধ করব। মূর্তি পাচার

কংগ্রেস তার কেন্দ্রের ক্ষমতায় টিকে থাকাকে চিরস্থায়ী করতে দু'টি বিশেষ নীতি নিয়েছে— (১) হিন্দু সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী বলে তাদের প্রতিচ্ছবি বিনষ্ট করা এবং (২) মুসলমান অস্মিতাকে তোষণের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া। কংগ্রেস দাবী করছে যে নিরাপত্তা এবং তদন্ত সংস্থাগুলো নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে। বাস্তবে তারা আদৌ নিরপেক্ষ নয় অথবা চাপ ব্যতিরেকে কাজ করছে এমনও নয়। আসলে কংগ্রেস তার বিরোধীদের জব্দ করার জন্য প্রতিরক্ষা এবং তদন্ত সংস্থাগুলোকে দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করে থাকে।

থেকে কংগ্রেস এন ডি এ জোট-কে হারিয়ে 'ইউ পি এ' তৈরি করে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়েছে তখন থেকেই কিন্তু তারা বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙঘকে বদনাম করার এবং 'হিন্দু ও হিন্দুত্ব'-কে অপমান করার অভিযান চালু রেখেছে। এমন একটা প্রচার করে 'হিন্দু সন্ত্রাস'-এর ভূত তৈরি করা হয়েছে যে লোকের মনে হবে— সকল হিন্দু সংগঠনই সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের জন্য দেশের একতা ও অখণ্ডতা সংকটাপন্ন। এমনকী সঙেঘর বরিষ্ঠ তাত্ত্বিক সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব ইন্দ্রেশকুমারকেও 'সন্ত্রাসবাদী' বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। অনেক বছর যাবৎ ইন্দ্রেশজী সঙেঘর পক্ষ থেকে হিন্দু-মুসলমান সদ্ভাব-এর জন্য প্রয়াস করে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে মুসলমান সমাজের একটা বেশ বড় অংশ সংযুক্ত হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রাহ্য করার মতো কোনও প্রমাণও নেই। রাজস্থান এ টি এস এখনও একথা বলেনি যে, ইন্দ্রেশকুমার আজমীর বিস্ফোরণের মূল সূত্রধর। প্রজ্ঞা ঠাকুরের প্রসঙ্গেও মহারাষ্ট্র পুলিশের 'তথাকথিত সত্য'-এর পর্দা ফাঁস হচ্ছে। হিন্দুত্বের চিন্তাধারার এবং অস্মিতার কারণেই কংগ্রেস কেন্দ্র থেকে গদীচ্যুত হয়েছিল এবং বিজেপি তথা এন ডি এ ক্ষমতা দখল করতে জনাদেশ লাভ করেছিল। বিজেপি বর্তমানে প্রধান বিরোধী দল এবং কংগ্রেস বাদে একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল।

কংগ্রেস তার কেন্দ্রের ক্ষমতায় টিকে থাকাকে চিরস্থায়ী করতে দু'টি বিশেষ নীতি নিয়েছে— (১) হিন্দু সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী বলে তাদের প্রতিচ্ছবি বিনষ্ট করা এবং (২) মুসলমান অস্মিতাকে তোষণের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া। কংগ্রেস দাবী করছে যে নিরাপত্তা এবং তদন্ত সংস্থাগুলো এবং বোফর্স ঘুস প্রসঙ্গে সোনিয়া গান্ধীর ভূমিকা নিয়ে সরাসরি অভিযোগ রয়েছে। জনতা পার্টির নেতা সুব্রামনিয়ান স্বামী ওই সকল বিষয়ে সোনিয়া গান্ধীকে আদালতে টেনে নিয়ে গেছেন। কোয়াত্রোচ্চিকে ক্লীন চীট (অভিযোগ মুক্ত) সোনিয়াই দেওয়া করিয়েছেন বলে অভিযোগ। বোফর্স কামান কেনার দালালিতে ঘুষ— কোয়াত্রোচ্চির বিরুদ্ধে প্রামাণ্য অভিযোগ আছে। সি বি আই-এর তৎকালীন প্রধান যোগিন্দর সিংহ এই 'প্রমাণ' যোগাড় করেছিলেন। রাজীব গান্ধীর রাজত্বকালে (প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে) সর্বত্রই কোয়াত্রোচ্চির রমরমা ছিল (কোয়াত্রোচ্চি কী তুতী বোলতী থী)। কোয়াত্রোচ্চি সোনিয়াকে ব্ল্যাকমেল করে তার নিজের নাম অভিযোগের তালিকা থেকে কেটে দিয়েছেন বলে মনে করা হয়। কোয়াত্রোচ্চি রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন। ঠক্কর কমিশন এবং জৈন কমিশন ইন্দিরা ও রাজীব হত্যায় আঙুল তুলেছেন— তার ফয়সালা এখনও হয়নি। সি আই এ (আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা) সারা পৃথিবীতেই শাসন ক্ষমতায় কে বসবে তার ওপর নির্দিষ্ট ভাবে লক্ষ্য রাখে। নিজেদের এজেন্টদের (সোহরেঁ) ক্ষমতার কেন্দ্রে আসীন করে। রাশিয়া টুকরো টুকরো হওয়ার পরে 'সি আই এ' ব্যাপক শক্তিশালী হয়। সীতারাম কেশরী (নরসিমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে) যখন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন তখন সি আই এ-র চূড়ান্ত সক্রিয়তা ছিল কংগ্রেসের সদর দপ্তর এবং স্বয়ং সীতারাম কেশরীর বাড়িতে। রাজনৈতিক মহলেও সে সময় একই কারণে একজন সাংবাদিকের দিকে আঙুল তোলা হয়েছিল, যিনি বর্তমানে নয়াদিল্লী ক্ষমতাকেন্দ্রে স্বমহিমায় বিরাজমান। ওই সাংবাদিক সি আই এ-র নির্দেশেই সীতারাম কেশরীর কবর খুঁড়ে সোনিয়া সমর্থক অর্জুন সিংহ, মাধবরাও সিন্ধিয়া, শীলা দীক্ষিত প্রভৃতি কংগ্রেসীদের কংগ্রেসের ক্ষমতাকেন্দ্রে পুনর্বাসনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তিকে আজও রাজনীতি তথা সংবাদমাধ্যমের জগতে (মহলে) সি আই এ-এর এজেন্ট হিসেবেই দেখা হয়। সুদর্শনজী সোনিয়া সম্পর্কে বেশ কিছু অভিযোগ করেছেন। তাই বলে হিংসাত্মক আক্রমণের দরকার হবে কেন? এটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কংগ্রেস অথবা 'ইউ পি এ' সরকারের এব্যাপারে তদন্ত করে দেখা উচিৎ সোনিয়া সত্যিসত্যিই সি আই এ-এর এজেন্ট কিনা!

তদন্ত-সংস্থাসমূহ এবং কংগ্রেস

কংগ্রেস বলছে যে, তদন্তকারী সংস্থার কাছে হিন্দু সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসে সংলিপ্ততা বিষয়ে তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। এধরনের প্রচার দীর্ঘদিন যাবৎ কংগ্রেস দল এবং ইউ পি এ সরকার করে আসছে। অথচ তদন্ত সংস্থাগুলোর কাছে যে তথ্য প্রমাণ আছে তা এখনও সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। বাকী আছে।

ঠোকাঠুকি লাগার জন্য দায়ী কে?...

কংগ্রেস এবং সঙেঘর মধ্যে সঙঘর্ষের যে পুনঃপ্রবাহ শুরু হয়েছে সেজন্য দায়ী কে? এর পটভূমিকা কে বা কারা প্রস্তুত করেছে? এর গূঢ়ার্থ কি? এই পরিস্থিতি কি দেশের স্থিরতা ও উন্নয়নের জন্যে উৎসাহদায়ক? তথাকথিত বুদ্ধি জীবীরা একথা ভেবে আত্মশ্লাঘা অনুভব করতেই পারেন যে, কংগ্রেস সঙঘকে ভালোমত শিক্ষা দিয়ে বেশ বাহাদুরী করছে। এই ভাবনাচিন্তা কোনওমতেই নিরপেক্ষ বা পক্ষপাতহীন হতে পারে না।

অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ঃ

একথা বাস্তব সত্য যে, হিন্দু সংগঠন সমূহের দুর্বলতা এবং তাদের প্রতি অবিশ্বাস কংগ্রেসের ক্ষমতা ধরে রাখার জীয়নকাঠি। হিন্দুত্ববাদ প্রবল হওয়ার ফলেই কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে সরে গিয়েছিল। কংগ্রেস ব্যতিরেকে বিজেপি-ই একমাত্র সর্বভারতীয় ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। এজন্যই কংগ্রেস হিন্দুত্বনিষ্ঠ-সংগঠনকে 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা দিয়ে তাদের প্রতিচ্ছবি বিনষ্ট করার নীতি চালু করেছে।

(দৈনিক সন্মার্গের সৌজন্যে।)

মুসলিম দুষ্কৃতীদের কবল থেকে উদ্ধার কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কর্ণাটকের একটি নামকরা স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী সুমনা রেড্ডি। পড়ায় ফাঁকি দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল চত্বরেই মারছিল আড্ডা। এখবর তার বাবার কানে পৌঁছলে মেয়েকে বকাঝকা, একটু-আধটু মারধোরও খেতে হয় বাবার হাতে। তাতেই অভিমান করে বাড়ি থেকে পালিয়ে ট্রেনে চড়ে সুদূর আসানসোলে এসে পৌঁছোয় সে। এরপর খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আসানসোল থেকে অন্ডালগামী ট্রেনে সাঁইথিয়া চলে যায় সুমনা। আর সাঁইতিয়া আসতেই পড়ে যায় কয়েকটি মুসলিম যুবকের পাল্লায়। ওই মুসলিম যুবকেরা তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার নাম করে সাঁইথিয়া-বহরমপুর বাসে চাপিয়ে বরুটিয়া বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে নিকটবর্তী মুসলিম-প্রধান ছোট তুড়ি গ্রামে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ততক্ষণে মেয়েটি বিপদের আঁচ পেয়ে মুসলিম যুবকদের সঙ্গে যেতে গররাজি হয়। এদের বাক-বিতন্ডা খেয়াল করেন স্থানীয় বুদ্ধ দেব বান্দী। তিনি এলাকার মানুষকে এনিয়ে অবহিত করলে তাঁরা মুসলিম যুবকদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন।

বিপদ বুঝে দুষ্কৃতকারী ওই মুসলিম যুবকেরা গা ঢাকা দেয়। মেয়েটিকে উদ্ধার করে বুদ্ধ দেব ও তার দাদা বরুটিয়া বাসস্ট্যান্ডস্থিত বি এস এন এল অফিসের কর্মী বিশ্বনাথ কর্ণাটকে সুমনার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে মেয়েটিকে তাঁর হাতে তুলে দেন। ঘটনার সাক্ষী ছিলেন রামপুরহাটের মহকুমাশাসক এবং স্থানীয় থানার ও সি। ঘটনাটি ঘটে গত ১৮ অক্টোবর।

মুসলিম তোষণ নীতির ভবিতব্য

(১ পাতার পর)

উৎসবের আর দেরি নেই। বুদ্ধ-মমতা-মানসের টিভি চ্যানেলে সরব উপস্থিতি রাজ্যবাসীকে জানিয়ে দিচ্ছে ভোট উৎসব আসছে। হ্যাঁ, গণতান্ত্রিক ভারতে সাধারণ মানুষের কাছে ভোটের দিনটি উৎসবের দিন। আনন্দের দিন। ওই বিশেষ দিনটিতে আমরা মানে আম জনতার সকলেই ভি আই পি। শাসক এবং বিরোধী দলের নেতা নেত্রীরা আমাদের অর্থাৎ জনতা-জনার্দ্দনের কৃপা লাভের জন্য হাতজোড় করে অপেক্ষা করেন। বিহার বিধানসভা থেকে সাম্প্রতিককালে সারা দেশের ছোট বড় বিভিন্ন গণতান্ত্রিক নির্বাচন পর্যন্ত একটি বার্তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে যে জনমানসে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভাব দ্রুত কমছে। এর প্রধান কারণ, ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের অন্ধ বিরোধিতা। হিন্দু ঐক্য নষ্ট করতে জাতপাতের বিষ সমাজে ঢুকিয়ে দেওয়া। যাতে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক রুখতে হিন্দুরা ভোট ব্যাঙ্ক গড়তে না পারে। জাতপাতের ভুলভুলাইয়াতে আত্মবিস্মৃত হিন্দু মনে করে ২৭ শতাংশ মুসলিম ভোটই নির্বাচনে শেষ কথা বলবে। এটাই কংগ্রেসের রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গে এই খেলাই খেলে থাকে সিপিএম-তৃণমূল-কংগ্রেস, তিন প্রধান রাজনৈতিক দলই। সংখ্যালঘু তোষণে বুদ্ধ আর মমতার মধ্যে কে এগিয়ে বলা শক্ত। তাঁরা মনে করেন মুসলিম ভোট পেলেই জেতা কেউ আটকাতে পারবে না। তাই মুর্শিদাবাদে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস উদ্বোধন করতে পেরে প্রণব মুখোপাধ্যায়-বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যরা এতটাই গদগদ। অথচ তাঁরা কেউই বলেন না যে কেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের একমাত্র আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়তে হবে? রাজ্যের অন্য আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে জাত ধর্ম সবই নষ্ট হবে নাকি? পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের জন্য পৃথক আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থাপনে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ভাল কথা। তবে ধর্মের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় গড়া হলে হিন্দুদের জন্য তা হবে না কেন? অন্ততপক্ষে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাস পশ্চিমবঙ্গে খোলা যেতেই পারতো। কিন্তু সে কথা বুদ্ধ-মমতা-প্রণবরা ভুলেও বলেন না। কারণ, ভোটের বাজারে হিন্দু ভোটের কানাকাড়ি মূল্য নেই। বাম-ডান সব নেতারাই জানেন বাঙালি হিন্দু ভোটার কট্টর সেকুলার। শুধুই ধর্ম নিরপেক্ষ নন, ভোটের দিন তাঁরা অনেকেই 'ধর্মহীন' হয়ে যান। ধর্মহীনতাকেই তাঁরা প্রগতিবাদ বলে মনে করেন। তাই হিন্দুদের পাত্তা না দিলেও চলবে। বাঙালি হিন্দুদের এই মানসিকতার জন্যই অরুন্ধতী রায় বা গিলানীরা পশ্চিমবঙ্গে বড়মাপের বুদ্ধিজীবী। তা তাঁরা দেশে-বিদেশে যতই ভারত বিরোধী প্রচার করে বেড়ান না কেন।

বিহারের নির্বাচনে 'উন্নয়ন' প্রধান থিম ছিল। জাতপাতের উপরে উঠে বিহারের আম জনতা যদি এই প্রশ্নে মতামত দিতে পারেন তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ধর্মীয় বিভেদের তাস খেলা এইসব নেতাদের তোষণ নীতির জবাব দিতে কুণ্ঠিত হবেন কেন? হ্যাঁ, সময় এসেছে সব দলেরই তোষণ নীতির প্রতিবাদ করার। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য রাজ্যে এই তোষণ নীতির জনক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠছে। তাই কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলেও ভারতের দুটি-তিনটির বেশি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় নেই। আর্থিক দুর্নীতি এবং মুসলিম তোষণ নীতি কংগ্রেসের রাজনৈতিক অস্তিত্বই মুছে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতাদের স্থির করতে হবে তাঁরা কী করবেন।

'দেগঙ্গা' এবার জয়নগরে

(১ পাতার পর)

অনিমা মণ্ডল ওইদিন মন্দিরে সন্ধ্যারতি করতে গিয়ে দেখতে পান একটি মাংসের টুকরো মেঝেতে পড়ে আছে। স্থানীয় মানুষজনকে ডেকে দেখালে সেটাকে তাঁরা গো-মাংস বলে সনাক্ত করেন। খবর শুনে জড়ো হন এলাকার প্রায় ৫০০ হিন্দু। ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য ছায়েমবারি শেখ এবং এস ইউ সি আই-এর জনৈক সদস্য রশিদ সাঁফুই শেখ মাংসখণ্ডটিকে নিয়ে গা-ঢাকা দিতে চান। মন্দিরে পড়ে থাকা মাংসটি যে গোরুর-ই ওই দুই রাজনৈতিক নেতার আচরণে তা প্রকাশ হয়ে পড়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় হিন্দুরা জয়নগর থানায় অভিযোগ জানানোর কথা বলেন। এর কিছু সময়ের মধ্যেই কয়েক'শো মুসলিম দুষ্কৃতী লাঠি ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। 'মুসলিম ভাইদের' একত্রিত করতে মাইকে তৎক্ষণাৎ প্রচারও চালানো হয়। ঘটনায় মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ এমনকী তেড়ে মারতেও আসতে দেখা যায় কয়েকটি মুসলিম যুবককে। এখানে জয়নগর থানা হস্তক্ষেপ করে। পুলিশের হস্তক্ষেপে মুসলিম দুষ্কৃতীরা সাময়িকভাবে পিছু হটে। থানায় এফ আই আর দায়ের করা হয় ওই দুই রাজনৈতিক নেতা সহ অন্তত দশ জনের নামে। ঘটনায় অভিযুক্তরা পুলিশের নাকের ডগায় থাকলেও এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। মন্দিরে দুই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকা থমথমে। স্থানীয় সূত্র বলছে মুসলিম দুষ্কৃতীরা হুমকি দিচ্ছে, 'পুলিশ চলে গেলে কারা বাঁচায় দেখবো' বলে।

ষড়যন্ত্রের জালে কাশ্মীর

(১ পাতার পর)

ভারতের 'বাড়বাড়ন্তে' কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে যাচ্ছিল ইরান। সম্প্রতি সেদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এই মর্মে আমেরিকার প্রস্তাবে সায় দেয় ভারত। ইতিপূর্বে ভারত প্রতিবারই এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল। অথচ এর আগে সৌদি আরব কিংবা অর্গানাইজেশন অব্ ইসলামিক কনফারেন্সের সদস্য অনেক দেশই ছিল মার্কিন প্রস্তাবের সপক্ষে। কূটনীতিবিদদের ধারণা, বর্তমানে গোটা বিশ্বের নিরীখে কূটনৈতিক সমীকরণগুলো দ্রুত বদলে যাচ্ছে, পূর্বাপেক্ষা জটিল হয়ে উঠছে। আর এই পরিস্থিতিতে কোনও অদৃশ্য সুতো মুসলিম দেশগুলোকে একসূত্রে গেঁথে দিচ্ছে। ইরান গত জুলাই থেকে এখনও পর্যন্ত অন্তত তিনবার কাশ্মীরের জনগণের 'সংগ্রাম'কে সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছে এবং গাজা ও আফগানিস্তানের 'নিপীড়িত ইসলামী জনতা'র সঙ্গে কাশ্মীরী জনতা-কে একই বন্ধনী-ভুক্ত করেছে। কূটনীতিবিদদের আশঙ্কা, ভারতের হাতে থাকা কাশ্মীরকে একা পাকিস্তান এবং কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পক্ষে এককভাবে ছিনিয়ে নেওয়া আপাতত রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক কোনওভাবেই সম্ভব নয় বুঝে, কোমর বেঁধে নেমেছে গোটা মুসলিম দুনিয়া-ই।

আবার ২৬/১১-র ছক

(১ পাতার পর)

সন্দিহান।

২৬/১১-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের 'প্রাথমিক টার্গেট' হিসেবে ডেভিড হেডলি গোয়েন্দাদের কাছে যে স্থানগুলির নামোল্লেখ করেছিল, পাঁচতারা হোটেলের পাশাপাশি সেসব স্থানেও জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। গত বছর-ই অন্তত শ' তিনেক গোয়েন্দা-সতর্কতা মহারাষ্ট্র পুলিশের কাছে এলেও সেগুলো ততটা ভয়ের হয়ে দাঁড়ায়নি, এবছরের শেষে তা যতটা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুম্বাই পুলিশের এক আধিকারিকের বক্তব্য, "এটা আমাদের কাছে বড় আঘাত। পাঁচতারা হোটেলগুলোতে তো বটেই, এমনকী মুম্বইয়ের আশেপাশেও যেমন চার্চগেট বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, মুম্বই পোর্ট ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় সহ হেডলি-উবাচ প্রতিটি স্থানেই নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করা হয়েছে।"

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার তাগিদে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যক্ষ উপেক্ষা করে চলছেন, তাতে মুম্বইয়ে পুনরায় ২৬/১১ ঠেকাতে এদেশের গোয়েন্দাদের এবং নিরাপত্তাবাহিনীর কাজটা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। আর এঁরা ব্যর্থ হলে কত অসংখ্য নিরীহ মানুষের যে কি শোচনীয় পরিণাম হবে কেন্দ্রীয় সরকার কি তা ভেবে দেখেছেন?

অযোধ্যার জমি রামলালারই জন্মভূমি ঃ নিশ্চলানন্দ সরস্বতী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ শঙ্করাচার্যের নামে অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে মন্দির মসজিদ পাশাপাশি থাকতে পারে বলে এক শ্রেণীর সংবাদ মাধ্যম যা প্রচার করছে তা বিভ্রান্তিকর বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সহ-প্রচারক অজিত মহাপাত্র। বিতর্কিত জমিতে মন্দির, মসজিদ পাশাপাশি থাকতে পারে। শঙ্কারাচার্য, এই শিরোনামে 'বর্তমান' পত্রিকার ১৯ নভেম্বর সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত বর্তমানে পুরীপীঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। তাঁর অভিমত হলো অযোধ্যায় যাকে বিতর্কিত জমি বলে প্রচার করা হচ্ছে তা ভগবান রামলালারই জন্মভূমি।

এই জন্মভূমিতে রামলালার মন্দির নির্মাণ হবে। এই জমির এক ইঞ্চি ও অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে দেওয়ার প্রশ্নই নেই।

আবার দেশভাগের উস্কানি

(১ পাতার পর)

যেভাবে ভারতবর্ষের জনগণের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল আজ তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংখ্যালঘুদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি পেতে হলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেভাবে মুসলিম যোদ্ধারা সংগ্রাম করেছিল সেইভাবে স্বদেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আর একবার এই ভারতবর্ষ স্বাধীন করতে হবে।" ১৯৪৬ সালে সুরাবর্দি কলকাতায় যে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর ডাক দিয়েছিলেন, এটা কি তারই প্রতিধ্বনি নয়?

একইরকমভাবে 'নতুন গতি' নামে একটি পত্রিকার ৪-১০ অক্টোবর, ২০১০ (২৪ শওয়াল-১ জেলক্বদ ১৪৩১) সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে, দেগঙ্গা থেকে ফিরে মহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস-এর রিপোর্টের শীর্ষক—'জীবন বিপন্ন করে হাঙ্গামা রুখলেন হাজী নুরুল ইসলাম' (!)। এই সংবাদে লেখা হয়েছে 'দেগঙ্গায় মুসলিমদেরই হেনস্থা করা হচ্ছে।'

'বঙ্গনূর'-এর জিয়াউল মণ্ডল তার নিবন্ধ শেষ করেছেন এইভাবে—"যেমনভাবে ইংরেজদের সাথে লড়াই করে আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছিলাম, আজ স্বদেশীদের সাথে লড়াই করে ভারতবর্ষকে আর একবার স্বাধীন করতে হবে। সেই লড়াইতে মুসলিম যোদ্ধারা জিতবেই। তিন হাজার সৈন্যর মোকাবিলায় তিনশ' সৈন্য নিয়ে জয়লাভ করেছিলেন আমাদের নবীজী স্বয়ং।"

রাজ্য রাজনীতি

এরাজ্যে সি পি এম হারছে— কংগ্রেস কোণঠাসা হচ্ছে

নিশাকর সোম

রাজ্যের সিপিএম দল ও তাদের পরিচালিত সরকার সমস্যার চক্রব্যূহে পরিবৃত হয়েছে। প্রথম সমস্যা হলো— রাজারহাট— এখানকার জমি অধিগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী। এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন হিডকোর চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের আবাসন মন্ত্রী ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দেব। গৌতম দেব লড়াকু মনোভাব নিয়ে বিতর্কে নেমেছেন। এই বিতর্কে আসল কথাটা বলেছেন তৃণমূল-নেত্রী। তিনি বলেছেন, জোর করে অনিচ্ছুকদের হাত থেকে জমি নেওয়া হয়েছে। সেটা যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েছে এমন কোনও ইতিবাচক জবাবও গৌতমবাবু দেননি। তবে মনে রাখা দরকার গৌতমবাবু অত্যন্ত কৌশলী এবং চতুরচূড়ামণি। তিনি জমি দেওয়ার ব্যাপারে, আবাসন মঞ্জুর করার ব্যাপারে এমনকী রাজারহাটে জমি দেওয়ার ব্যাপারেও নিজের পার্টির সব লোককে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে বিরোধীদের দিয়েছেন। রাজারহাটের ব্যাপারে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেকথা গৌতম দেব নিজেই বলেছেন।

এই বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ মানস ভুঁইঞা। তিনি বলেছেন, "এই এক জায়গায় শান্তিতে জমি অধিগ্রহণ হয়েছে।"

মানসবাবুর বক্তব্য, এত লোক টাকা লগ্নি করেছেন— তাঁদের অসুবিধা সৃষ্টি করার দরকার নেই। মানসবাবুর জবাবে তৃণমূলের যুবসংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি মদন মিত্র মানসবাবু-কে 'সিপিএম-এর দালাল, বুদ্ধ বাবুর মানসপুত্র' ইত্যাদি বলে আক্রমণ করেছেন। এর উত্তরে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা ওমপ্রকাশ বলেছেন, তৃণমূল নেত্রী আগে যাঁদের সিপিএম-এর লোক বলতেন— তাঁদের নিয়ে এখন ঘর করছেন। এর পরেই সুব্রত মুখোপাধ্যায় মানসবাবুকে আবার সিপিএম-এর দালাল বলেছেন। 'ধবনিটিরে প্রতিধবনি সদা ব্যঙ্গ করে, ধবনিটির কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।' দীর্ঘ এক দশকের পরে রাজারহাটে তৃণমূল নন্দীগ্রাম কায়দায় আন্দোলন করবে। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তৃণমূল সাংসদ সোমেন মিত্র রাজারহাটের একটি প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নাম দিয়ে বিজ্ঞাপনও তৃণমূলের অঘোষিত দৈনিকে ছাপা হয়েছিল। শোনা যাচ্ছে, রাজারহাটে একাধিক তৃণমূল নেতা-সাংসদের জমি কেনা আছে। সিঙ্গুরেও তো সোমেন মিত্র-এর জমি আছে। আরও উল্লেখ্য, রাজারহাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সিপিএম-এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নেতা বলেছেন 'সোমেন মিত্র রাজারহাটের কাজে সাহায্য করেছেন।' এখানে উল্লেখ্য যে সোমেন মিত্রের সঙ্গে দলীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েই মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেন। আবার পরবর্তীকালে প্রদেশ কংগ্রেসে 'যথাযথ মর্যাদা' (যেটা সোমেন জায়া শিখা মিত্রের বক্তব্য) না পেয়ে তৃণমূলে সোমেন মিত্রের প্রবেশ এবং সাংসদ হওয়া। শিয়ালদহ স্টেশনের গায়ে দেওয়াল লিখনে দেখা যাচ্ছে— 'সোমেনদা (ছোড়দা) এগিয়ে যাও, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।' সোমেন মিত্র এগিয়ে গিয়েছেন। সঙ্গীরা পেছনেই থাকলেন, থাকবেনও। সোমেন মিত্র রাজনীতিতে দড়ির খেলা দেখাতেন— দেখালেনও। ধন্য তাঁর ক্যারিশ্মা। আর একনেতা সুব্রত মুখার্জি— তাঁকে মমতা ব্যানার্জি তরমুজ কংগ্রেস বলতেন আর সুব্রতবাবু মমতাকে 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' বলতেন। ইতিহাস আজ সুব্রতবাবুকে মেয়র পদের কথা কি স্মরণ করায়? এইসব নেতারা (সব নেতাই সিপিএম-এরও) নিজেদের আত্মীয় পরিজনদের আখের গুছিয়ে নিয়েই সন্তুষ্ট। ফিরেও তাকায় না সাধারণ কর্মীদের দিকে। এর ফলে এক হতাশা— তার ফলে নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারার উন্মেষ হবেই। মানসবাবু সম্পর্কে মদন মিত্রের বক্তব্য 'মানস আর সবং-এর ৫০ জন'। মানসবাবুকে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব চুপ করে থাকতে বলেছেন। কারণ কেন্দ্রে কংগ্রেস আজ কোণঠাসা। সুপ্রিম কোর্ট ও ক্যাগ-এর বক্তব্য তাদের বিঁধছে। আর সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসনে না আসাই ভাল। ক্যাগ সম্বন্ধে প্রণব মুখার্জির বক্তব্য 'ক্যাগ গীতা নয়।' অথচ এই কথাগুলি যখন সিপিএম এরাজ্যে অহরহ বলে তখন কংগ্রেস সেই কথারই সমালোচনা করে! সিপিএম নেতা গৌতম দেব রাজারহাট নিয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, তিনি গৌতম দেবের জবাব দেবেন না। কারণ গৌতম তাঁর ক্যাটাগরিতে পড়ে না।

সিপিএমের অভ্যন্তরের আসল ঘটনা হলো— বুদ্ধ, বিমান, নিরুপম, শ্যামল-কে চুপ করে থাকতে বলে সামনে এসেছেন গৌতম, রবীন, দীপক, সুশান্ত। এঁরাই নির্বাচনে প্রধান পরিচালক মণ্ড লী হবেন। এদিকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আবার পশ্চি মবঙ্গ এবং কেরলের মন্ত্রিসভা তথা পার্টি নেতৃত্বের সমালোচনা করা হয়েছে।

সিপিএমের অভ্যন্তরের আসল ঘটনা হলো— বুদ্ধ, বিমান, নিরুপম, শ্যামল-কে চুপ করে থাকতে বলে সামনে এসেছেন গৌতম, রবীন, দীপক, সুশান্ত। এঁরাই নির্বাচনে প্রধান পরিচালকমণ্ডলী হবেন। এদিকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আবার পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলের মন্ত্রিসভা তথা পার্টি নেতৃত্বের সমালোচনা করা হয়েছে।

এর গূঢ় কারণ হলো— টাকার লোভে নির্বাচনের আগে এই ম্যাসলম্যানরা যাতে তৃণমূলে চলে না যায়, তাই তাদের আটকে দেওয়ার চাল দিচ্ছেন সিপিএম নেতৃত্ব। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগে ব্যর্থ হলে সব ফানুস ফেটে যাবে।

সম্প্রতি কলেজের পার্টটাইম শিক্ষকরা উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরীর ঘরে বিক্ষোভ দেখান। সংবাদে প্রকাশ তাঁরা উচ্চ-শিক্ষামন্ত্রী এবং বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রীকে নাকি হেনস্থা করেছেন। সিপিএম মনে করেন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের সময়ে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিকে মহাকরণ-এ কো-অর্ডিনেশন-এর কর্মীরাও হেনস্থা করেছিলেন। সুদর্শনবাবু খবর রাখেননি যে তাঁর দপ্তরের জনৈক মণ্ডলমশাই অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের ফাইল মাসের পর মাস আটকে রেখে তাঁদের যন্ত্রণা দিচ্ছেন? এর ফলে এঁরাও একদিন হয়তো যাহোক একটা কাণ্ড ঘটাতে পারেন!

নির্বাচনের পর কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বের খোল-নলচে বদলে যাবেই। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-কে 'আর্থিক দেউলিয়া' করে দিলেন অসীম দাশগুপ্ত। এর আগেও একবার এই কীর্তি অসীম দাশগুপ্ত করেছিলেন। তখন তাঁর উপর মনিটরিং করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এখন রাজ্যের যা আর্থিক অবস্থা তাতে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ কি হবে? শিক্ষকগণ কি বেতন পাবেন?

সিপিএম রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া। এখন রাজ্যকে আর্থিকভাবে দেউলিয়া করে দিয়েছে। এই দল ভোটের ব্যাপারেও কি দেউলিয়া হতে চলেছে?

সিপিএম দলে ম্যাসলম্যানদের ধরে রাখার জন্য হোল টাইমার করার টোপ দিচ্ছে— পাঁচ হাজার টাকার ভাতা ছাড়া এতে সব সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস রয়েছে।

সিপিএম রাজত্ব চলে যাবে— এর স্থলে ইতিবাচক শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টিকারী জনকল্যাণমুখী সরকার দরকার। তা হতে পারে একমাত্র বিজেপিসহ সকল বিরোধী দলের ন্যূনতম কমসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ মোর্চার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটাই আজকে এ-রাজ্যের আশু প্রয়োজন।

অন্য রকম

মুনসিরামের সংসার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিটার কথা মনে আছে? বহু নামজাদা শিল্পীর অভিনয়গুণে সমৃদ্ধ এই ছবিটি কিন্তু আজও দর্শকমনে স্মরণীয় হয়ে আছে। ছবিটির একটা 'ম্যাজিক' ছিল, ম্যাজিকটা হলো একান্নবর্তী পরিবারের। ইদানিংকালে বোকাবাক্সের দৌলতে বেশ কিছু সিরিয়াল বা চলচ্চিত্রেও আমরা এই ধরনের কাহিনী দেখতেও পাই। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়, কেরিয়ারের ইঁদুর দৌড়ে কি আদৌ অস্তিত্ব আছে এই ম্যাজিকের? এই ম্যাজিকের স্বাদ যদি পেতে চান, তাহলে আমাদের পৌঁছে যেতে হবে হরিয়ানার রাসুই গ্রামে। সাক্ষী হতে হবে রাসুইয়ের বাসিন্দা মুনসিরামের নিত্য জীবন ধারার সঙ্গে।

পরিবারের সবার সঙ্গে মুনিসরাম (একেবারে বাঁদিকে)।

আধুনিক সময়, যখন সবাই 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'র কনসেপ্টকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছেন, ঠিক তখনই একান্নবর্তী পরিবারের আধিপত্য স্থাপন করে দিব্যি একটি 'নয়া' নজির গড়েছেন ১০৩ বছরের এই বৃদ্ধ টি। প্রায় পাঁচ প্রজন্মের বাস তার বাড়িতে। একই ছাদের তলায়, এক সাথে। তবু আজও সংসারের গৃহকর্তা তিনি। বর্তমানে তার ছেলের বয়স ৭২। ছেলে রঘুবীরের কথায়, "বয়স বাড়লেও, আমার বাবা ঠিক আগের মতোই সুস্থ এবং সবল আছেন। আজও তিনি নিজের কাজ নিজে করেন, কারুর উপর নির্ভরশীল নন।" বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুনসিরাম হারিয়েছেন নিজের শ্রবণশক্তি। পরে গেছে মুখের দাঁতও, তবু আজও তার শরীর রোগের কবল থেকে পুরোপুরি মুক্ত। আজও তিনি খেতে পছন্দ করেন দেশী ঘি'য়ের হালুয়া আর রুটি চুর্মা— এসব কথা জানালেন রঘুবীর।

রাসুইয়ের মাটির সঙ্গে মুনসিরামের যোগসূত্রের প্রথম ভিতটি গড়েন মুনসিরামের ঠাকুর্দাই। তাঁর ঠাকুরর্দা-রা ছিলেন ১০ ভাই। গ্রামের মধ্যে একই সারিতে দশটা বাড়িতে বসবাস শুরু করে তারা। তাদের পরবর্তী তিন প্রজন্মের মধ্যেও এই ধারা ছিল অব্যাহত। এই তিন প্রজন্মের মধ্যে ছিলেন কেবলমাত্র একজন করে পুরুষ সদস্য যারা একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেন।

বর্তমানে মুনসিরামের পরিবারে ছেলে রঘুবীর ছাড়াও রয়েছেন রঘুবীরের পুত্র রামধন, রামধনের পুত্র পবন ও পবনের শিশু সন্তানও। নিজে কৃষক হলেও, সন্তানকে আবদ্ধ করে রাখতে চাননি কৃষিকাজের মধ্যে। তাই ১৯৫০ সালে স্ত্রীবিয়োগের পর নিজের পরিবারিক পরম্পরা বেড়া ভেঙে পুত্র রঘুবীরকে পাঠিয়ে দিলেন ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশে'র (আই টি বি পি) চাকরিতে। সেই সময় ছ'টা সন্তানকে মানুষ করতে পুত্রবধূকেও সহযোগিতা করেছেন তিনি। এমনকী বিয়ের আগে নিজের চারজন নাতনিকেও স্কুলে ভর্তি করে দেন তিনি। ১৮৮৫ সালে আই টি বি পি থেকে রঘুবীর গ্রামে ফিরে এলে সংসারের লাগাম তিনি তুলে দেন ছেলের হাতে। তবু আজও পারিবারিক বা অর্থনৈতিক ব্যাপারে মুনসিরামের মতামত নিয়েই কাজে অগ্রসর হন রঘুবীর।

যুগ বদলেছে। বদলেছে সময়। বদলেছে সম্পর্কের অর্থও। বয়সের ভারকে অগ্রাহ্য করে জীবনের পথে এগিয়ে গেলেও, সত্যিই কি যুগের হাওয়ায় নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরতে পেরেছেন মুনসিরাম? নাকি আটকে পড়েছেন 'জেনারেশন গ্যাপে'র সমস্যায়? পুত্র রঘুবীরের বক্তব্যানুযায়ী, "তিনি যে সময়কার মানুষ, সেই সময় মহিলারা অন্য পুরুষদের সামনে কথা বলত না। তারা সব সময় পর্দার আড়ালেই থাকত। কিন্তু আমার পুত্রবধূ ও নাতবৌরা আমাকে 'দাদাজী' বলে সম্বোধন করে এবং তাঁকেও সম্মান দেয়। কিন্তু তিনি এসব মন থেকে মেনে নিতে পারেন না এবং তাদের খুঁত ধরেন। যেহেতু তিনি নিজের শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন, ফলে তাদের ক্ষোভের কথা তিনি শুনতে পান না। তবে আমাদের পরিবারের শান্তি আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং পাঁচ প্রজন্ম ধরে আমরা আজও রয়েছি একসাথে।"

রঘুবীরের নাতিরা বর্তমানে গ্রামের মধ্যে মোবাইল ও ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির দোকান চালান। তাদের জীবনধারার সঙ্গেও একমত হতে পারেন না মুনসিরাম।

একটি বাড়ির স্থাপত্যকে বছরের পর বছর টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার বাড়ির মজবুত ভিত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম নিজের পরিবারকে একত্রে ধরে রাখতে সেই ভিত-ই হলেন মুনসিরাম। তাই-তো 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'র বর্তমান ধারণার দুনিয়ায় তাদের পরিবার সত্যিই ব্যতিক্রমী। একটু 'অন্যরকম'।

চট্টগ্রাম অস্ত্র চোরাচালান মামলার আসামী লুৎফজ্জামান বাবরের স্বীকারোক্তি

উলফা'র কাছ থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলার ঘুষ বাংলাদেশ সরকারের

সংবাদাদাতা।। যে চট্টগ্রামে একদা দাপিয়ে বেড়াত ইংরেজ রাজকর্মচারীরা, যে চট্টগ্রামে কয়েকজন তরুণ মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ইংরেজ রাজত্বের ভিতসুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই চট্টগ্রাম এখন ভারত-বিরোধী গতিবিধির এক প্রধান কেন্দ্র। খালেদা জিয়ার আমলে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ভারতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র চালান হোত অবাধে। আর তার 'মিডল্‌ম্যান' অসমের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংগঠন 'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম'-এর কম্যান্ডার ইন্ চীফ্ পরেশ বরুয়া।

খালেদা জিয়ার আমলে ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে এক জাহাজভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালানের মাধ্যমে ভারতের সন্ত্রাসবাদীদের কাছে পৌঁছানো হয় বাংলাদেশ সরকারের জ্ঞাতসারে। একথা ফাঁস করে দিয়েছেন খালেদা জিয়া জমানার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফজ্জামান বাবর। দশ ট্রাক অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে দেওয়ার জন্য যে ঘুষ (৯৯.৪ মিলিয়ন ডলার) দেওয়া হয় তা ঢাকার দক্ষিণ এশিয় দেশের দূতাবাসে লেন-দেন হয় এবং তা সেদেশের সরকারের জ্ঞাতসারেই হয়েছিল।

বাবর

বাবরের বক্তব্য— তিনি কিছু করতে পারেননি যেহেতু তাঁর ওপরওয়ালারা আদেশ দিয়েছিলেন কিছু না করার জন্যে। একথা বাবর সি আই ডি-কে জানিয়েছে। সে খবর বাংলাদেশের ইংরেজী দৈনিক বড়দ্ব ডদ্ভ্রনপুস্ত ত্রব্ধ্রজ-এ গত ১১ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। জিয়ার মন্ত্রিসভায় বাবর ২০০১ থেকে '০৬ পর্যন্ত মন্ত্রী ছিলেন।

তবে বাবর ওই 'দূতাবাসের নাম

সালাউদ্দিন চৌধুরী

বলেননি। ওই দশ ট্রাক ভর্তি অস্ত্রের মধ্যে সাব-মেসিনগান, একে ৪৭ রাইফেল, অন্যান্য আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, বুলেটও ছিল। বাংলাদেশের মাটিকে আশ্রয় করেই 'উলফা' ভারতে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছিল। যে ওয়্যারহাউসে ওইসকল আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সেখানকার নিরাপত্তারক্ষীরাও আগ্নেয়াস্ত্রের কথা কবুল করেছে।

যে জাহাজে করে চীন থেকে ওইসব অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশে আনা হয় তারও মালিক ছিলেন খালেদার বি এন পি দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ওরফে সাকা চৌধুরী। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অফিসাররা যাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা দপ্তরের দুই প্রাক্তন প্রধান এবং ডি জি এফ আই-এর ডিরেক্টর। তবে, বাবর ঘুষের ভাগ পাননি বলে বলছেন। যা জানিয়েছেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার 'ঊর্ধবতন কর্তৃপক্ষ' কারা তা— জিজ্ঞাসা করা হলে বাবর চুপ থেকেছেন বলে অফিসাররা জানিয়েছেন। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর উলফা'র অনেক শিবির বাংলাদেশে বন্ধ করা হয়েছে, কিছু জঙ্গিদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনধিকৃতভাবে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় উলফা নেতাকে ভারতের হাতে প্রত্যর্পণও করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই, বাংলাদেশ ভারতের স্বার্থরক্ষা করবে। এখনও বাংলাদেশের ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু সেনাবাহিনী। সেখানে ভারত-বিরোধী পাকিস্তানপন্থীদের প্রাধান্য বজায় আছে। যে কারণে ভারত বাংলাদেশকে ব্যাপক সাহায্য দেওয়ার পরও 'পরেশ বরুয়ার' টিকি ছুঁতে পারেনি। হাসিনাকেও সামলাতে হয়েছে বি ডি আর-বিদ্রোহ। চীনের সঙ্গেও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্বন্ধ দৃঢ় হচ্ছে, যা ভারতের পক্ষে উদ্বেগজনক।

ভারতই এখন সন্ত্রাসী ইলিয়াস গোষ্ঠীর টার্গেট

ইলিয়াস কাশ্মীরী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আমেরিকার 'কাউন্টার টেররিজম্' দপ্তরের পক্ষ থেকে ভারত-বিরোধী পাকিস্তানী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর প্রধান একচক্ষু ইলিয়াস কাশ্মীরীকে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম সন্ত্রাসবাদী বলে সাবধান করা হয়েছে। সম্প্রতি এখবর জানিয়েছে আমেরিকার বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম 'সি এন এন।'

কানা কাশ্মীরী (ইলিয়াস) ভারতকেই তার এক নম্বর শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছে বলে জানা গেছে। পুণার জার্মান বেকারীতে বিস্ফোরণে ইলিসাসের গোষ্ঠীকেই দায়ী করা হয়েছে কাউন্টার টেররিজমের ওই রিপোর্টে। প্রসঙ্গত, ওই বিস্ফোরণে ভারতীয় সহ বেশ কয়েকজন বিদেশীও মারা যান। বেকারিটিতে বিদেশীদের যাতায়াত ভালোমত ছিল। আমেরিকান চ্যানেলটির মতে দক্ষিণ এশিয়া বাদে অন্যান্য এলাকাও কানা ইলিয়াসের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে। এর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণও আছে।

"ইলিয়াস কাশ্মীরীর একটি চোখ এবং একটি আঙুল নেই। হেনা মাখানো ঘন চুল। চোখে গাঢ় কালো চশমা ব্যবহার করে ইলিয়াস। চল্লিশোর্ধ এই ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদীর ছবি খুব একটা পাওয়া যায় না। হুজি বা 'হরকত উল জিহাদ ইসলামি' জিহাদি গোষ্ঠীর ব্রিগেড ৩১৩-র কম্যাণ্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরী আল কায়েদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পাকিস্তানের সীমান্তপ্রদেশের বনাঞ্চলে তাদের রীতিমতো গতিবিধি রয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দাদের মতে ইলিয়াসের সক্রিয়তা আটলান্টিকের (মহাসাগর) দু'পারেই রয়েছে। কাশ্মীরী ইউরোপে মুম্বাই-এর ধাঁচে আক্রমণ চালানোর ছক কষে চলেছে বলেও গোয়েন্দা সূত্র উদ্ধৃত করে সি এন এন

ওয়ামান জওয়াহিরি ও ওসামা বিন লাদেন।

জানিয়েছে। পাকিস্তানের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বহুসংখ্যক বিদেশী জিহাদী রয়েছে। পাক-সেনাবাহিনীর জনৈক আধিকারিকের মতে ওই সংখ্যাটা দশ হাজারেরও বেশি। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রমণের নায়ক মহম্মদ আটাও ইলিয়াসেরই রিক্রুট। এরকম একজনের নাম আহমেদ সিদ্দিকী। সে গত জুলাই মাসে আফগানিস্তানে বাগরাম বিমানঘাঁটিতে আমেরিকান বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সি এন এন এবং ইউরোপীয়ান কাউন্টার টেররিজম্ সূত্রের মতে সিদ্দিকী কয়েকবার ইলিয়াসের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছে। অন্য একজন জেহাদির নাম হলো রাজা লাহারসিক খান। সে শিকাগোতে ট্যাক্সিচালকের কাজ করে। সে ২০০৮-এবং ২০০৯-এ পাকিস্তান যাতায়াত করেছে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই ২০১০-এ। তার বিরুদ্ধে 'আল কায়েদা'-কে সাহায্য করার অভিযোগ করেছে আমেরিকার গোয়েন্দারা।

গোয়েন্দাদের বক্তব্য, ইলিয়াস কাশ্মীরী জেহাদিদেরকে তাদের বিরোধীদের থেকে আড়াল করা, দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা, অন্যান্য পাকিস্তানী জেহাদিদের তার গোষ্ঠীতে সংযুক্ত করার বিষয়ে দারুণ দক্ষ। আল কায়েদার ছাতার তলায় থেকে সে নিজস্ব গোষ্ঠী বাড়িয়ে যায়। মার্কিন গোয়েন্দাদের মতে— যদি ওসামা বিন লাদেন আল কায়দার ইসলামিক নেতা, মিশরীয় মৌলবী আয়েমান আল জওয়াহিরি দার্শনিক বা তাত্ত্বিক নেতা, তাহলে কাশ্মীরী অবশ্যই আল কায়েদা বাহিনীর সামরিক মাথা বা মিলিটারি ব্রেন।

গুজরাটে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ‘অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সী ফ্যাক্টর’ কাজ করে না কেন ?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সী ফ্যাক্টর (সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেবার প্রবণতা) কাজ করে না কেন? মোদী ৯ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন। যে সমস্যাগুলো অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ক্ষেত্রে জটিল ও সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে, সেই সমস্যাগুলোও তাঁকে গুজরাটের মসনদ থেকে এক বিন্দুও টলাতে পারেনি। উত্তরটা লুকিয়ে আছে প্রত্যহ তাঁর ব্যতিক্রমী ও সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মধ্যে, যা জনসমক্ষে এমন একজন শাসকের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে যিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বোঝেন। এই বিষয়ে নামকরা এক সমাজসেবী যাকে মোদী-অনুরাগীদের দশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে মোটেও ফেলা যায় না, জানালেন “তাঁর সাফল্যের মূল উৎসই হলো কিছু জনপ্রিয় ও অনেক স্বল্প-জনপ্রিয় কিন্তু জন- কল্যাণমূলক কিছু অনুষ্ঠান, যেগুলো তিনি কোনও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রত্যাশা ছাড়াই সমান সক্রিয়তায় কার্যকর করেন। এই নতুন প্রচেষ্টাটাই সাধারণ মানুষের চোখে পড়েছে। মোদীর সরকার মহিলা, শিশু ও দরিদ্রদের কথা ভাবে— সাধারণ মানুষের মধ্যে এই চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতাও তাঁকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে।”

মোদী সরকারের এহেন কর্মসংস্কৃতির সাক্ষী বহন করছেন সৌরাষ্ট্রের দোলরাজীর বাসিন্দা জনৈক শ্রমিক— ফিরোজ শেখ। ফিরোজের চার বছরের ছেলের হৃদপিণ্ডের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল অকস্মাৎ। কিন্তু ছেলের চিকিৎসা করাবার মতো অর্থ ফিরোজের ছিল না। সেই সময় ফিরোজের পাশে দাঁড়ায় মোদী সরকার।

সরকারের উদ্যোগে আমেদাবাদের ইউ এন মেহেতা ইন্সটিটিউট অফ কার্ডিওলজিতে নিরখরচায় করানো হয় ছেলেটির অপারেশন। এছাড়া সরকারের দৌলতে ফিরোজ-পুত্রের মতো এমনই প্রায় ২০০০ হৃদরোগে আক্রান্ত দরিদ্র রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থাও এই ইন্সটিটিউটে করা হয়েছে। ছেলে সুস্থ হওয়াতে যারপরনাই খুশীতে আপ্লুত ফিরোজ জানান— ‘এটা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে একমাত্র মোদী সরকারই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের জন্য ভাবেন।’ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ আর কে প্যাটেল এই বিষয়ে বললেন, “প্রকল্পটির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষরা এখান থেকে নিখরচায় যে কোনও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারবেন। মোদী সরকারের এই অভিনবত্বই গরীব মানুষদের সরকারের প্রতি আস্থাশীল করে তুলেছে।”

সম্প্রতি রাজ্য নির্বাচনে বিজেপির জয়লাভের পেছনেও মূলত এই কারণটাই সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হয়েছে।

মোদীর একটি পুরানো প্রকল্পের নাম ‘স্বাগত’, যেটা আন্তর্জাতিক স্তরেও বহু পুরস্কার প্রাপ্ত। সেই প্রকল্প অনুযায়ী, প্রত্যেক মাসে মুখ্যমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের সাহায্যে উচ্চপদস্থ অফিসার ও জেলাশাসকদের বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক অভিযোগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রকল্পটি দারুণভাবে সাফল্যলাভ করেছে এবং রাজ্যের আমলাতন্ত্রকে উদ্বেগপূর্ণ অনিশ্চিত (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আমলার ভাষায় টেনটার-হুকস) অবস্থায় পরিণত করেছে।

এছাড়াও সারা রাজ্যব্যাপী সাধারণ মানুষের স্বার্থে এমন বহু প্রকল্পের সূচনা করেছেন মোদী। এইরকমই একটি প্রকল্প অনুযায়ী, প্রায় ৭০টি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকবে রাজ্যের প্রায় ২৫০টি কেন্দ্র। এই পরিষেবাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাজ্যবাসীকে বিভিন্ন লাইসেন্স ও শংসাপত্র প্রদান। প্রকল্পগুলির কর্মকাণ্ডের পর্যবেক্ষণ অনলাইনের মাধ্যমে করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং।

কন্যা কেলাবনি (শিশু কন্যা শিক্ষা) প্রকল্পটির স্রষ্টাও ছিলেন খোদ্ নরেন্দ্র মোদী। তিনি বছরে একবার তাঁর আই এ এস অফিসারদের নিয়ে গুজরাটের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যান। গ্রামে গিয়ে তিনি গ্রামবাসীদের তাদের কন্যা সন্তানগুলিকে গৃহকর্মে নিযুক্ত না করে শিক্ষাদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন।

রাজ্য নারী এবং শিশু কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ‘বেটি বাঁচাও আন্দোলন’ (শিশুকন্যা রক্ষায় আন্দোলন) প্রকল্পটিও রাজ্যে লিঙ্গ চিহ্নিতকরণ পরীক্ষা ও মহিলা নবজাত শিশু হত্যার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়ানোর সঙ্গে যুক্ত। সমস্ত রাজ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রেও মোদীর ভূমিকা লক্ষণীয়। রাজ্যের সরকারী স্কুলগুলিতে সঠিক ছাত্রসংখ্যা যাচাই করার উদ্দেশ্যে সরকার সূচনা করেন ‘গুণোৎসব’ (Gunotsav)-এর। তিনি আই এ এস অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে গুজরাটের প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলগুলিতে যেতেন। পড়ুয়াদের পড়াশুনার যথার্থ মূল্যায়নের স্বার্থে প্রত্যেক বিভাগ অনুযায়ী নিজে প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করতেন। তাঁর এই কর্মপন্থা— সরকারী স্কুল পড়ুয়ারা যে শহরের পড়ুয়াদের চেয়ে কতটা পিছিয়ে আছে সেটাই প্রমাণ করেছিল। এর ফলে এনিয়ে যথার্থ ব্যবস্থা নিতেও সরকার অগ্রসর হতে পেরেছিল। সাম্প্রতিক সময় পড়ুয়াদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কিছুদিন আগে ‘ভাঞ্চে গুজরাট’ (জানুন গুজরাটকে) নামক একটি প্রচার অভিযানেরও আয়োজন করেন মোদী।

সারা রাজ্যে এই অভিযানে প্রায় ৭০ লক্ষ পড়ুয়া স্রেফ বই পড়তে এগিয়ে এসেছিল। মোদী সরকার আরেকটি প্রকল্পের আয়োজন করেন যার দ্বারা রাজ্যের বহু গ্রন্থাগারিক স্ব-উদ্যোগে গ্রামের স্কুলগুলিতে বইপত্র নিয়ে যায় এবং সেখানকার শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পড়ুয়াদের সেই বইগুলো পড়তে বলে। তবে শুধু শিক্ষা আর সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যেই কেবল মোদী অগ্রসর হননি, রাজ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিকাশের দিকেও তাঁর সমান লক্ষ্য আছে। অক্টোবরের শেষের দিকে গুজরাটের গান্ধীনগরে তিনি আয়োজন করেন গুজরাট খেল মহাকুম্ভ। প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় মল্লক্রীড়া, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে নিজেদের নথিভুক্ত করেছে। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেই শুধুমাত্র ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল।

আমেদাবাদের জেলা শাসক হরিৎ শুক্লার বক্তব্য “ভোটের সময় ভোটব্যাঙ্কের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে রঙিন টিভি দেওয়ার প্রবণতা জনগণ দেখেছেন। সাম্প্রতিক সময়, মোদীর একটি আলাদা স্বীকৃতি গড়ে উঠেছে। তিনি এমন এক ব্র্যান্ড গড়ে তুলেছেন যার লক্ষ্য শুধু ভোট পাওয়া-ই নয়। বরং সেটা মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়, একদম নীচু তলার মানুষ অবধি। এটাই মোদীর সবচেয়ে বড় কমিউনিকেশনের প্রতিভা।” তাই পরবর্তী নির্বাচনের জন্য ‘ব্র্যান্ড মোদী’ প্রস্তুত এখন থেকেই।

‘অর্থনৈতিক উন্নতি’র প্রকোপে বিপন্ন বাঘেদের অস্তিত্ব-ই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কথাতেই আছে “বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।” কিন্তু বর্তমানে বন্যপ্রাণীরা কি আদৌ জঙ্গলের মধ্যে মাতৃক্রোড়ের মতো নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাস করছে? শহরের থেকে বেশ দূরে গভীর অরণ্যের বুকে আদৌ কি তাদের জীবন সৌন্দর্য্যে ভরা? প্রশ্নগুলো অদ্ভুত মনে হলেও অবাস্তব নয়। ইদানীংকালে সরকারের উদাসীনতা ও স্বার্থান্ধ মানুষের অত্যাচারে বিপন্ন হয়ে পড়েছে বনের জীবজন্তুদের জীবনও। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ঝাড়খণ্ডের পালামৌ ব্যাঘ্র প্রকল্পের নাম। হায়দরাবাদের সেন্টার ফর সেলুলার এণ্ড মলিকিউলার বায়োলজির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, “একসময় এখানে আধিপত্য ছিল প্রায় ১৭টি বাঘের। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৬টি বাঘের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।” সূত্রানুযায়ী, জঙ্গলের মধ্যে সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটিই এর জন্য দায়ী।

সত্তর দশকের গোড়ার কথা। জঙ্গলে বাঘেদের সংখ্যা হ্রাস রুখতে একগুচ্ছ ব্যাঘ্রসুরক্ষা প্রকল্প শুরু করেন কেন্দ্রীয় সরকার। এমনই একটি প্রকল্পের নাম প্রোজেক্ট টাইগার। প্রোজেক্ট টাইগারের দৌলতে বাঘেদের সংখ্যা ১২০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩০০০-এ। কিন্তু পরবর্তীকালে, সরকারের সবরকম প্রচেষ্টাকেই মুখোমুখি হতে হয় চরম ব্যর্থতার। বিশেষজ্ঞরা এর জন্য দায়ী করছেন সরকারী তরফের সদিচ্ছাকেই।

দেশের প্রসিদ্ধ বন্যপ্রাণী সংরক্ষক ও ব্যাঙ্গালোরের সেন্টার ফর ওয়াইল্ড লাইফ স্টাডিজের ডিরেক্টর কে উল্লাস কারান্তের মতে বনদপ্তরের বিভিন্ন ব্যয়বহুল কর্মপন্থাই বর্তমানে বাঘ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মূল বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার সমাধান করতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে একত্রিত হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বানও তিনি জানান।

ঝাড়খণ্ডের পালামৌ সুরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর পি. উপাধ্যায়ের কথায়, “পালামৌ টাইগার রিজার্ভের চৌহদ্দিগুলো হলো— বেটলা, গারু পূর্ব ও পশ্চিম, চিপাডহর পূর্ব ও পশ্চিম, বারেসনার ও কুটকু। মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা হবার সুবাদে বনদপ্তরের কর্মচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব জায়গার উপর দিয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। ফলে বিঘ্নতার সৃষ্টি হয় তাদের কাজেও। যদিও ৯০ ভাগ কর্মচারীই স্থানীয় লোক। তাই তারা কোনওভাবে জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করলেও, বাদ পড়ে যায় মাওবাদী সংলগ্ন এলাকাগুলো।”

প্রায় ৪৯টির বেশি বাঘ পালামৌ ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকাগুলির বুকে দাপিয়ে বেড়াতো। কিন্তু এখন হাতে গোনা কয়েকটি বাঘেরই দেখা পাওয়া যায় এখানে। গারু, বারেসনার ও বেটলা এলাকাগুলি গ্রাম সংলগ্ন, তাই অনেকের মতে, অবাধে বাঘ শিকারের ফলেই ঘটেছে এই বিপর্যয়। তবে এই যুক্তি মানতে নারাজ পি উপাধ্যায়। তিনি জানালেন, এইরকম কোনও ঘটনা ইদানীংকালে ঘটেনি। তবে কখনও এইসব এলাকাগুলো থেকে গ্রামের মধ্যে হরিণ ঢুকলে গ্রামবাসীরা তাকে মেরে ফেলে। ওয়াইল্ড লাইফ ফিল্মমেকার ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষক শেখর দাত্তারী এই প্রসঙ্গে বলেন, “বর্তমানে এই সমস্যার সমাধান করতে হলে জঙ্গলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর জোর দিতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এলাকাগুলিতে যে সমস্ত নিরাপত্তা রক্ষীদের নিযুক্ত করা হয়, তারা কেউ সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। ফলে তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে বার বার ব্যর্থ হচ্ছেন। এছাড়া তাদেরকে মাসের পর মাস বঞ্চিত রাখা হয়, এমনকী তাদের মাস-মাইনে থেকেও। বন্যপ্রাণীরাই বনের সম্পদ। তাই তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে রাজ্য সরকারকে। সহযোগিতা করতে হবে স্থানীয় জনজাতিদেরও।”

চীনের আগ্রাসন এবার ব্রহ্মপুত্র নদেও

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ব্রহ্মপুত্র নদে একটি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করার কথা অবশেষে স্বীকার করল চীন। ৫১০ মেগাওয়াট জাঙ্গমু (zangmu) জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম ৬টি বিদ্যুৎ উৎপাদক ইউনিটের কাজও শুরু হয়ে যাবে ২০১৪ সালের মধ্যেই বলে জানিয়েছে চীন। প্রসঙ্গত, ব্রহ্মপুত্র নদের নানা দেশে নানা নাম। ভারতবর্ষের আসামে এর নাম ব্রহ্মপুত্র। যার উৎসস্থল দক্ষিণ-পশ্চিম তিববতে, তার নাম ইয়ারলাঙ্ সাংপো। অরুণাচলে দিহাং এবং বাংলাদেশে যমুনা ইত্যাদি। চীন অরুণাচলে কথায় ও কাজে যে আগ্রাসন প্রক্রিয়া জারি রেখেছে এবং আসামের দিকে যেভাবে তার ‘কু-নজর’ বিস্তৃত করেছে সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র নদে জলবিদ্যুৎ নির্মাণ তারই পরবর্তী পদক্ষেপ বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান।

এই বিষয়ে চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা জিন হুয়া (Xin Hua) গত ১৭ নভেম্বর জানায়, ১২ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণ কাজের সূচনা হয়েছে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সচিবদের দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির প্রধান দায়িত্বে আছেন মন্ত্রিসভার সচিব। ব্রহ্মপুত্র নদের পারিপার্শ্বিক নির্বাচিত জমিগুলোতেও উন্নতিকল্পে চলছে আপাতত পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া। এর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে উপগ্রহের প্রতিবিম্ব এবং অন্যান্য কলাকৌশলও।

এই ব্যাপারে গত ১৭ নভেম্বর বিদেশ সচিব নিরুপমা রাও প্রশ্ন তোলায় নিউ দিল্লীকে বেজিং আশ্বাস দিয়ে বলে যে প্রকল্পটি ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দিয়েই নির্মাণ করা হবে। স্রোতের উপর এই নির্মাণ কার্যের কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে প্রকল্পটির কার্যকারিতা ও সার্থকতা নিয়ে চীন যতই আশ্বাস দিক, এ ব্যাপারে ভারতের আধিকারিক ও বিশেষজ্ঞমহল কিন্তু বেশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ‘দ্য চাইনিজ পীপুলস্ ডেইলি’ এই প্রসঙ্গে গত ১৭ নভেম্বর জানায়, ‘চীনের এই প্রকল্পটির মূল কাজ হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন। তবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিকার্যেও ব্যবহৃত করা হবে এই বাঁধটি। কিন্তু এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করছেন বিশেষজ্ঞমহল। তাদের মতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জলের প্রয়োজন ভিন্নমুখ ও তা সংরক্ষণেরও প্রয়োজন। জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কথায় ‘যদিও প্রকল্পটিকে জল সংরক্ষণ বা নদের উপর দিয়ে নির্মাণ করার কথা বলা হয়েছে, তবুও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংরক্ষণের কাঠামো থাকা আবশ্যিক। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রেও জলকে ভিন্ন মুখ করা দরকার। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ভারতের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক— চীনের ক্ষেত্রে নয়।’

প্রকল্পটি কার্যকর করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চায়না হুয়ানেংগ গোষ্ঠীকে (China Huaneng Group)। এই সংস্থার মুখ্য ঠিকাদার লি চাওয়ি (Li Chaoyi)-র মতে, প্রকল্পটি নির্মাণ কার্যের সময় ব্রহ্মপুত্র নদের জলকে রোধ করা হবে না। প্রকল্পটির কাজ শুরু হলে নদের জল বাষ্প বা জলের দ্বারা চালিত ঘূর্ণনযন্ত্রবিশেষ ও জলকপাটের (স্লুইস গেট) মাধ্যমে স্রোতে ভেসে যাবে।”

লাসা (Lhasa) থেকে ৩২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত প্রকল্পটির বাৎসরিক গড় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হলো ২.৫ বিলিয়ান কে. ডব্লু. এইচ্। জিন্ হুয়া বলেন, ‘যে ছয়টি ইউনিট প্রকল্পটিতে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে, সেই একেকটি ইউনিটের উৎপাদনের ক্ষমতা হলো ৮৫ মেগাওয়াট, যার জন্য ব্যয় করতে হবে প্রায় ৭.৯ বিলিয়ান ইয়ান (চীনের মুদ্রা)।

জাঙ্গমু এবং ভারতের বাগলিহারের মধ্যে চীন সমান্তরালভাবে পাকিস্তানে প্রবাহিত হওয়ার আগে চেনারের উপর দিয়ে বয়ে চলা প্রকল্প দেখিয়েছে।

যদিও ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে নদীর জল ভাগাভাগির প্রসঙ্গটি ১৯৬০ সালে হওয়া সিন্ধু-জল চুক্তি-তে উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু চীনের সঙ্গে ভারতের এহেন কোনও চুক্তি এখনও পর্যন্ত সম্পাদন হয়নি। যদিও বেজিং ক্রমাগত এব্যাপারে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করে চলেছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের গৃহীত প্রস্তাব

জাতীয় পুনরুত্থানের লক্ষ্যে পালিত হোক রবীন্দ্রনাথের জন্ম সার্ধশতবর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও চিন্তাধারাকে স্মরণ করে জাতির জীবনে পুনরুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করা আজকের দিনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

জন্ম-৭ মে, ১৮৬১ (বাংলা ১২৬৮ সাল, ২৫ বৈশাখ)। বর্ধিষ্ণু ঠাকুর পরিবারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অত্যুচ্চ ব্যক্তিত্ব, বহুমুখী প্রতিভা ও জীবন সমর্পিত হয়েছিল সমাজের কাজে, যা তাঁকে গত শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সামাজিক, ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাঁর জীবনই তাঁর আদর্শের মূর্ত-প্রকাশ এবং তাঁর সাহিত্য রচিত হয়েছিল শাশ্বত ভারতীয় মূল্যবোধের প্রতি অবিচলিত আস্থা রেখেই।

তিনি আর্জি করেছিলেন যেন আমরা হৃদয়ের শুদ্ধতা এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়েই শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে আমাদের আদর্শ হিসেবে দেখি। তিনি একইসঙ্গে মতামত প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, এই গৌরবময় প্রাচীন জাতির ইতিহাসের প্রবহমানতার মধ্যে দিয়ে যে মহান চিন্তাধারা ও দর্শনের উদ্ভব হয়েছে তাকে যথাযথ সম্মান না করায় আমাদের ঔদ্ধত্য ও লজ্জা-ই প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্মকে ভিত্তি করে রাজা শিবাজীর জাতি গঠনের চেষ্টা এবং তাঁর নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শিখ গুরু-দের এবং বান্দা বৈরাগীর শহীদী পরম্পরা তাঁকে চমৎকৃত করেছিল।

স্বদেশ-ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি। যেমন, ধর্ম ও রিলিজিয়ন এক বস্তু নয় এবং ধর্মের তর্জমা করলে তার অর্থ রিলিজিয়ন হয় না। আমাদের 'রাষ্ট্র' ধারণার সঙ্গে ইউরোপীয়দের 'জাতি' ধারণার পার্থক্য রয়েছে। ইউরোপীয় দর্শন ও দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে যে সমস্ত 'পরিভাষা' রচিত হয়েছে আমাদের প্রেক্ষিতে তা অনাবশ্যক। ভারতবর্ষের মুসলিম ও খৃস্টানদের পরিচয় তারা 'হিন্দু'। আমাদের অবনমনের জন্য আমরাই দায়ী কারণ যদিও আমাদের ভাষা, রিলিজিয়ন এবং আঞ্চলিকভাবে একটা সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য রয়েছে। কিন্তু এগুলির সঙ্কীর্ণ ধারণাও একইসঙ্গে আমাদের বহুধা বিভক্ত করে রেখেছে। আমরা জাত-পাত নিয়ে, অস্পৃশ্যতা নিয়ে বিভক্ত হয়ে রয়েছি।— এমনই সব কথা তিনি লিখেছিলেন। তিনি বহুবার ভারতের ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন।

১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতন' দেখিয়েছিল, প্রাচীন পরম্পরার গুরুকুল শিক্ষার আধুনিক রূপ। সমাজের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি এখানে শিক্ষিত

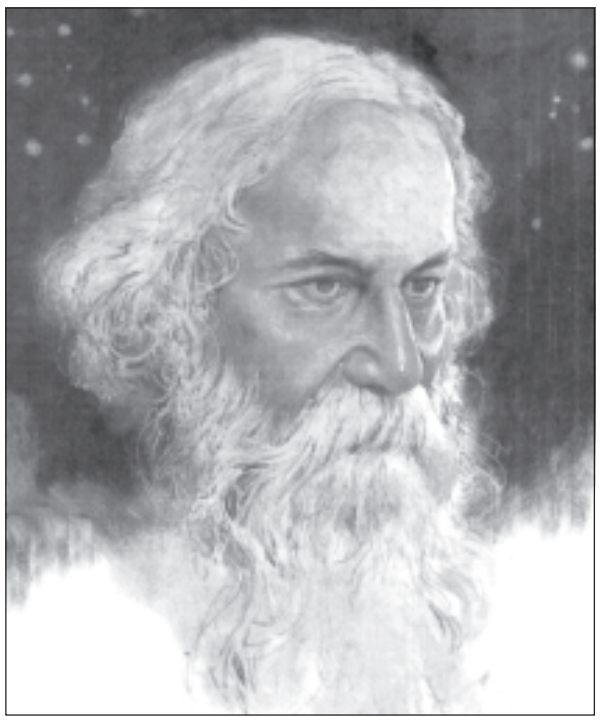

হয়েছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মার্গারেট নোবেলকে 'অগ্নিকন্যা নিবেদিতা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। এই নামটিই পরবর্তীকালে গৃহীত হয় এবং স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে এই খেতাব প্রদান করেন। নারীশিক্ষায় নিবেদিতার প্রচেষ্টার পেছনেও সমর্থন ছিল রবীন্দ্রনাথের।

লর্ড কার্জনের বলপূর্বক বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ-আন্দোলনে সারা দেশ জুড়ে স্বদেশপ্রেমের অভূতপূর্ব জোয়ার পরিলক্ষিত হয়েছিল। এরই প্রেক্ষাপটে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান এই আন্দোলনের সূচনা করে। এই আন্দোলন ছিল স্বদেশী আন্দোলনও। রবীন্দ্রনাথের লেখনী স্বদেশী ধ্যান-ধারণা-কে আরও প্রকটিত করেছিল সেই সময়। কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি স্বয়ং 'বন্দেমাতরম্' গেয়েছিলেন।

১৯১২ সালে কয়েকটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি' রচনা করার জন্য প্রথম ভারতীয় হিসাবে ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। বেদ এবং উপনিষদের মর্মগাথাই বিধৃত ছিল 'গীতাঞ্জলি'-তে। জন-গণ-মন গানটির রচয়িতা তিনি। যে গানটি পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসেবে আমাদের সংবিধানে গৃহীত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যালীলার প্রতিবাদে বৃটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট হুড' উপাধি পরিত্যাগ করেন তিনি। বিধান-পরিষদে ধর্মভিত্তিক আসন সংরক্ষণের কট্টর বিরোধী ছিলেন তিনি। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর বিদেশে যাওয়ার খরচা তুলতে বহু মানুষ এমনকী ত্রিপুরার মহারাজের কাছ থেকেও স্ব-উদ্যোগে অর্থ-সংগ্রহে নেমেছিলেন তিনি।

সেই সময়কার বহু দেশ-নেতা এমনকী মহাত্মা গান্ধীও তাঁকে 'প্রেরণার উৎস' (সোর্স অব্ ইনসপিরেশন) বলে মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের ধর্মোপদেশ এবং নিজের জীবন দিয়ে নিজেকে চেনানো— মহাত্মা গান্ধী তাঁকে এজন্যই 'গুরুদেব' বলে সম্মানিত করেছিলেন।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষ স্মরণে যে অনুষ্ঠানগুলি হবে তাতে সমকালীন ভারতবর্ষে তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা মানুষকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা তুলে ধরা হোক।

সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পৌষ কৃষ্ণ অষ্টমী, বিক্রম সংবত ১৯১৮, ২৫ ডিসেম্বর ১৮৬১ খৃস্টাব্দে-এ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ তাঁর সার্ধশতবর্ষের পুণ্য জন্মতিথিকে স্মরণ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছে। মালব্যজী এক মহান রাষ্ট্রভক্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, বহু পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, কুশল ব্যবহারজীবী তথা ওজস্বী বাগ্মী ছিলেন। মহান গো-ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান মন্দির নির্মাণের প্রেরণাপুরুষ এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মালব্যজী বিভিন্ন স্থানে পাঠশালা, গোশালা এবং মুমুক্ষু আশ্রম স্থাপন করেছিলেন।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে মন্ত্রমুগ্ধকর ভাষণের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা শুরু। তিনি দু'বার কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি হয়েছিলেন এবং বারো বছর হিন্দু মহাসভাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গান্ধীজী তাঁকে সবসময় একজন স্থিতধী ব্যক্তি তথা নিজের আধ্যাত্মিক গুরু বলে শ্রদ্ধা করতেন।

দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই তিনি শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে শিক্ষাকে তিনি হিন্দুত্বের আলোকে উজ্জীবিত করে প্রায় বিশ বৎসর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তাঁর সংকল্প ছিল ধর্ম ও নীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে থাকবে এবং তা যুবকদের চরিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করবে। তিনি মনে করতেন, ধর্মই চরিত্র নির্মাণের ভিত্তি ও আনন্দের উৎস। এই কারণেই তিনি সংস্কৃত শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরের মধ্যেই গীতা প্রবচন-এর পরম্পরা শুরু করেছিলেন যা আজও নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরের মধ্যে নির্মিত কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের দরজার উপর লেখা আছে— 'হিন্দুনাম মানবর্ধন' অর্থাৎ হিন্দুদের সম্মান বৃদ্ধি ই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর দ্বিতীয় সরসঙঘচালক শ্রীগুরুজী ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। সেই সময় তিনি মালব্যজীর সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভ করেছিলেন। মালব্যজীর আশীর্বাদেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরের মধ্যেই সঙঘ কার্যালয় নির্মাণ তথা সঙঘ কার্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন।

এটা একটা মণিকাঞ্চন যোগ বলতে হবে যে তিনি একাধারে সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতা ও মহান শিক্ষাবিদ ছিলেন। শিক্ষা ও সমাজ সেবার সঙ্কল্প সম্পূর্ণরূপে পালন করার জন্য ১৯১১ খৃস্টাব্দে তিনি নিজেই জমজমাট ওকালতি পেশা ত্যাগ করেন। এরপর এদেশের সন্ন্যাসী পরম্পরা অনুযায়ী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু চৌরীচৌরা কাণ্ডে ১৭৭ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর ফাঁসীর সংবাদ শুনে তিনি আবার উকিল হিসাবে আদালতে সওয়াল করেন এবং ১৫৬ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ফাঁসীর হাত থেকে মুক্ত করেন।

অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ বলে কথিত মানুষদের তিনি হিন্দু সমাজের অভিন্ন অঙ্গ হিসেবে স্বীকার করে তাদের জন্য মন্ত্র দীক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আত্মীয় সুলভ ব্যবহার ও বিশ্বাসযোগ্যতার কারণে ডঃ আম্বেদকরকে পুণা চুক্তিতে রাজী

করাতে তিনি সফল হয়েছিলেন। স্বদেশী পণ্য, ভাবনা-চিন্তা, আচার-আচরণ, স্বভাষা ও স্বদেশী শিল্প সম্পর্কে তাঁর যেমন স্বাভিমান ছিল তেমনই নিজেদের সংস্কৃতির মূল্যবোধ-এর প্রতিও তাঁর গভীর আস্থা ছিল। গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত প্রবাহিত গঙ্গাধারাকে অবরুদ্ধ করার জন্য ইংরেজ শাসকদের প্রয়াস তিনি প্রতিহত করেছিলেন।

মুসলিম তোষণনীতির তিনি সর্বদা বিরোধিতা করে এসেছেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে মুসলমানদের জন্য 'পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী'-এর প্রস্তাব এবং ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন-এ কংগ্রেসের যোগদানের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। দেশভাগের বিনিময়ে যাতে দেশের স্বাধীনতা না কেনা হয়— এই মর্মে তিনি ১৯৪২ সালে গান্ধীজীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার খবর শুনে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। হিন্দু সমাজ সংগঠিত হয়ে যাতে আততায়ীদের মোকাবিলা করতে পারে এজন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

মৃত্যুর সময় নিজের মুক্তির কথা না ভেবে তিনি জাতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুনর্জন্মের কথা চিন্তা করতেন।

সংক্ষেপে বলা যায় যে রাজনৈতিক নেতা হয়েও তিনি রাজনীতির উপরে ছিলেন। তিনি ধর্মের সমর্থক ও মৌলাবাদীদের বিরোধী ছিলেন। আধুনিকতা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলির প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। তিনি সমাজের জন্য ভিক্ষুক এবং ব্যক্তিজীবনে মহান দাতা ছিলেন।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল রাজ্য সরকারগুলির কাছে অনুরোধ করছে যে তারা যেন তারা যেন মালব্যজীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠ্যসূচীতে তাঁর জীবনী অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিকতা রক্ষা করেন। কার্যকরী মণ্ডল তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। সেইসঙ্গে স্বয়ংসেবক তথা সকল দেশবাসীকে মালব্যজীর কর্মময় জীবন থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে নবীন প্রজন্মকে নির্মাণের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হতে এবং হিন্দু জীবন মূল্যবোধগুলি নিজেদের জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে অনুরোধ জানাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভগ্নদশা কেন?

নবকুমার ভট্টাচার্য

রাজ্যে স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে নতুন আইন করতে চলেছেন রাজ্য সরকার। যে সরকারের আয়ু আর মাত্র কয়েক মাস, তারা কবে আইন করবেন আর সেই আইন রাজ্যে কবে থেকে লাগু হবে তা রহস্যাবৃত। কিন্তু এই রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের কি ছবি আমরা প্রত্যহ দেখছি? হাসপাতালের আউটডোর, ওয়ার্ড, অপারেশন থিয়েটার সর্বত্র-ই চূড়ান্ত অপেশাদারী দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের প্রকাশ। সর্বত্র আবর্জনা, দুর্গন্ধ। রোগীর আর তাঁর আত্মীয়দের হয়রানি। হাসপাতাল চত্বরে কুকুর বিড়াল আরশোলার দৌরাত্ম্য, সঙ্গে দালালের উৎপাত। গত ২৯ জুলাই রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসা কেন্দ্র (নিবন্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিল ২০১০ বিধানসভায় পেশ করলেন। তাঁর মতে এই

বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় শিশু মৃত্যুর পরিচিত দৃশ্য। (ফাইল চিত্র)

আইন চালু হলে রাজ্যে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারকে তা সুরক্ষিত করবে। বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলি আর মুমূর্ষু রোগীদের টাকা পয়সা না থাকার অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। অনেকেরই স্মরণে রয়েছে এ বছর এপ্রিল মাসে বাইপাস সংলগ্ন দুটি কর্পোরেট হাসপাতালে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ টাকা জমা দিতে না পারার জন্য পথ দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত রোগীকে ভর্তি করতে অস্বীকার করে। ফলে ব্যাপক হাঙ্গামা এবং হাসপাতাল ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। অপরদিকে রোগী মৃত্যুর কারণেও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে হাঙ্গামা হয়। এই বিলে বলা হয়েছে, সমস্ত বেসরকারি ক্লিনিক বা হাসপাতালকে সঠিক গুণমান বজায়

রাখার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ বসাতে হবে। বর্জ্যপদার্থ সঠিকভাবে অপসারণ করতে হবে। উপযুক্ত চিকিৎসক ও কর্মচারী পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখতে হবে। অনৈতিক কাজকর্ম করা ও অন্যায় চার্জ নেওয়া চলবে না। রোগীদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন, সমস্ত ধরনের সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে এই আইনের বাইরে রাখা কেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাসপাতালগুলি কি স্বর্গতুল্য। সেখানে কি সব ঠিক চলে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তাব্যক্তিরা যখন দাবি করে থাকেন যে রাজ্যের সত্তর শতাংশ মানুষ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে চিকিৎসা নেন, তখন এই সত্তর শতাংশ মানুষকে গুণমানের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা কেন? তাহলে কি ধরতে হবে সরকারি হাসপাতালের গুণমান এতই ভালো? বাস্তব ছবি কি বলে? যে কোনও হাসপাতালের ছবি— পূতিগন্ধময় নারকীয় পরিবেশ, কুকুর বিড়ালের অবাধ বিচরণ, দিনের পর দিন প্যাথোলজি-এক্সরে প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে থাকায় অসহায় মানুষের যাতায়াত, হাসপাতালের মধ্যেই মদের ঠেক, পেসমেকার কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের অপারেশন থিয়েটারের মধ্যেও স্বচ্ছন্দ যাতায়াত— এসব কোন নৈতিকতার উদাহরণ? এই রাজ্যের কোনও হাসপাতালে ডাক্তার নার্স ছাড়া সরকারি চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত কোনও কর্মীদেরই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এর ফলে হাসপাতালের আউটডোর, ওয়ার্ড, অপারেশন থিয়েটার সর্বত্রই অগোছালো। আর্ত অসুস্থ মানুষের জন্য একটু ভালোবাসা, সহমর্মিতা কোথাও নেই। হাসপাতালের ব্যবস্থা-অব্যবস্থা নিয়ে চৌত্রিশ বছরে বাম সরকার কোনও সমীক্ষা করেননি। জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির কোনও খবর রাখেননি। কেবল নজর দিয়েছে দলদাস চিকিৎসক-নার্স ও কর্মীবাহিনী তৈরি করতে। এই সরকারের সমস্ত অপকর্ম অপদার্থতাকে আড়াল করতে এই চিকিৎসক নার্স কর্মীবাহিনী অসাধারণ দক্ষতায় কাজ করে গেছে। বিনিময়ে এরা পেয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। ফলে বিদেশি ঋণের টাকায় অকেজো যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে, রোগীর জন্য বরাদ্দ পথ্য চলে গেছে বাজারে। সাড়ে তিন দশকের বাম সরকার এরাজ্যের জন্য কোনও চিকিৎসা নীতি তৈরি করেনি। সরকার কোনওদিন বলেনি রাজ্যের কতজন মানুষকে কোন্ মানের চিকিৎসা দিতে পারবে তারা। সরকার নিজেই জানে না এরাজ্যের মানুষের জন্য কতজন ডাক্তার, নার্স দরকার, কী ধরনের ডাক্তার চাই, কী কী ওষুধপত্র ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। সরকার ও মন্ত্রীমহোদয় বড় মুখ করে বলে থাকেন ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান না। কেন গ্রামে ডাক্তাররা যেতে চান না তার কারণ সরকারের অজানা নেই। গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে এতদিনেও কোনও পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি কেন— এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যায় না, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, তার ওপর রয়েছে গ্রামীণ রাজনীতি দলের উৎপাত। ২০০৭ সালে প্রকাশিত ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে-৩ থেকে জানা যাচ্ছে— মেয়েদের মধ্যে ১৮ বছরের নীচে বিয়ে হয়ে যায় গ্রামাঞ্চলে। বিহারে ৬৯

পোড়া কপাল! বিদ্যুতের অভাবে রোগীর অস্ত্রোপচারে ভরসা হ্যারিকেন। (ফাইল চিত্র)

শতাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬৩ শতাংশ আর পশ্চিমবঙ্গে ৬২ শতাংশ। শহরে এই হার যথাক্রমে ৩৮, ৩৬ আর ৩১ শতাংশ। আবার ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে মা হয়ে যায় এরাজ্যে ও বিহারে ২৫ শতাংশ। সেখানে সারা দেশের হার ১৬ শতাংশ। শিশুমৃত্যুর হার এক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৪৮ শতাংশ আর সারা ভারতে ৫৭ শতাংশ। ১ মাসের মধ্যে শিশুদের মৃত্যুর হার পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ শতাংশ আর ভারতে ৩৯ শতাংশ। ১ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১০ আর সারা ভারতে ১৮ শতাংশ। পাঁচ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৬৪ শতাংশ আর সারা ভারতে ৪৪ শতাংশ। কোনওভাবে টীকা নেয়নি পশ্চিমবঙ্গে ৬ শতাংশ আর সারা ভারতে ৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প জননী সুরক্ষা যোজনায় হাসপাতালে প্রসব করানোর উৎসাহদানের জন্য এককালীন টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে গৃহে প্রসবের হার ৫২.৩ শতাংশ আর হাসপাতালে ৪৭.৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পটি চালু করার পর পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতালে প্রসবের হার বেড়েছে ১৮.৬ শতাংশ অথচ পাশের রাজ্য ওড়িশায় এই হার ৭২ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৯৮ শতাংশ, রাজস্থানে ৫৫ শতাংশ। রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে বেসরকারি হাসপাতালগুলির এত রমরমা অবস্থা। যদিও রাজ্য সরকার নিজেই মুনাফার লক্ষ্যে সদা সচেষ্ট। চিকিৎসা বিক্রি করতে কোনও ছুঁৎমার্গ নেই এই সরকারের। এরাজ্যে বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র তৈরি করতে সরকারি উৎসাহ, উদ্যোগ, সাহায্য, সহায়তা উল্লেখযোগ্য। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী বেসরকারি হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করতে অতিমাত্রায় উৎসাহী। তাই সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভগ্নদশা দেখেও তারা নিশ্চুপ।

প্যাটেল ও দেশভাগ

আমার লেখা 'প্যাটেল ও দেশবিভাগ' সম্পর্কিত নিবন্ধটা নিয়ে শ্রদ্ধেয় বিমলেন্দু ঘোষ মহাশয় আবার একটা দীর্ঘ চিঠি দিয়েছেন। তাঁর লেখা যখন প্রকাশিত হয়েছে, তখন আমি হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। এখনও আমি অসুস্থ। তবু কিছু লিখতে হচ্ছে।

গোড়াতেই তিনি একটা মারাত্মক ভুল করেছেন। দেশবিভাগের ব্যাপারে আমরা একবারও এককভাবে প্যাটেলকে দায়ী করিনি। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং অন্য কয়েকজন নেতা ছাড়া বাকিরা এই ব্যাপারে কম-বেশি দায়ী। ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাবটা ১৫৭/২৯ ভোটে গৃহীত হয়েছিল, ৩২ জন সদস্য ভোট দেননি। সুতরাং বলা যায়—কংগ্রেসের ওই ৬১ জন ছাড়া সবার-ই এই ব্যাপারে দায় আছে—(ভি. পি. মেনন—ট্রান্সফার অফ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ ৩৮২)।

তবে কংগ্রেসীদের মধ্যে এই ব্যাপারে বেশী দায়ী ছিলেন গান্ধী, নেহ্রু ও প্যাটেল। নেহ্রুর ভূমিকা নিয়ে আমরা 'দ্য স্টেট্সম্যান' পত্রিকায় লিখেছি, গান্ধীর দায় নিয়ে লিখেছি 'বর্তমান' এবং অন্যান্য কয়েকটা পত্র-পত্রিকায়। প্যাটেলের বিষয়ে লিখেছি 'স্বস্তিকা'য়। এক্ষেত্রে আমার একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল প্যাটেলের ভূমিকা। বিমলেন্দুবাবু আজাদের দায়-দায়িত্বের প্রশ্ন তুলেছেন। এই ব্যাপারে আজাদের ভূমিকা নিয়েও পৃথক আলোচনা করা যায়। কিন্তু তিনি মূলত নেহ্রু ও প্যাটেলকে দায়ী করায় বিমলেন্দু ঘোষ তার সমালোচনা করেছেন।

কিন্তু মস্লে এবং ক্যাম্পবেল জনসন প্যাটেলের দুর্বলতার দিকটা দেখিয়েছেন। তাহলে শ্রী ঘোষ তাঁদেরও নিন্দা করবেন? ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাবেন? প্যাটেল ও আজাদের ভূমিকা একই রকম ছিল?

আজাদের কথা আপাতত থাক। প্যাটেলের ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করি—

১. মাউন্ট্ব্যাটেন ভারতে আসার আগেই তিনি পাঞ্জাব বিভাজনের উদ্যোগ নিলেন কেন? তার ফলে বড়লাট তাকে বলতে পেরেছেনে—নীতিগতভাবে তিনি দেশভাগের বিরোধী নন। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো—প্রস্তাবটা কংগ্রেসে পাশ করা হয়েছে এমন সময় যখন গান্ধী বিহারে এবং আজাদ গুরুতর অসুস্থ ও অনুপস্থিত। প্যাটেল ও নেহ্রু চেষ্টা করেছেন যাতে যথাসম্ভব দেরিতে গান্ধী ও আজাদ ব্যাপারটা জানতে পারেন। মস্লের ভাষায়—'And even after it was passed, steps were taken to keep it secret and no message was sent to Gandhi to tell him what had taken place'–(দ্য লাস্ট ডেজ অফ দ্য ব্রিটিশ রাজ, পৃ.১০৮)। এই লুকোচুরিটা কেন?

২. ক্যাম্পবেল জন্সনের লেখায় (মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন) আছে—প্যাটেলের সঙ্গে প্রথম বৈঠকের আগে বড়লাট চিন্তিত ছিলেন 'শক্ত' মানুষটাকে 'নরম' করতে পারবেন কিনা—এই চিন্তায়। সেই প্যাটেল একটা বৈঠকেই কুপোকাৎ হলেন কেন?

৩. প্যাটেল তারপর গান্ধীকে নরম করেছেন—এই অভিযোগটা শুধু আজাদের নয়, আরও অনেকেরই। ডঃ এস. গোপাল মন্তব্য করেছেন—নেহ্রু ও প্যাটেল ধরে নিয়েছিলেন যে, দেশবিভাগ ছাড়া কোনও উপায় নেই—(জওহরলাল নেহ্রু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫)। তবে প্যাটেলই গান্ধীকে প্রভাবিত করেছিলেন বেশি করে। ডাঃ এস. এন. সেনের মতে, 'Gandhi's hardened attitude towards partition began to wear away due to the pressure put on him by Mountbatten and Patel'—(হিস্ট্রি অফ ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ ৩৩৪)। তবে বড়লাটের চাপটা ছিল পরোক্ষ, প্যাটেলেরটা প্রত্যক্ষ। ডঃ অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'এবারও প্যাটেল ও নেহরুকে ভারতভাগে রাজী করানোর সঙ্গে সঙ্গেই মাউন্টব্যাটেন তাঁর ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করে ফেলেন'—(স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক-আপসমুখী আন্দোলন, পৃঃ ১৪৬)। এই কারণে বড়লাট গান্ধীকে বলতে পেরেছিলেন—'Mr. Gandhi, this Congress Working Committee is with me'—(উদ্ধৃত নরেন দাস—বিপ্লবী-আন্দোলনের জিজ্ঞাসা, পৃঃ ১৯৮)।

শ্রী ঘোষের সঙ্গে আমি একমত—ভারত তখন দ্রুত গতিতে দেশ-ভাগের দিকে এগোচ্ছিল—প্যাটেল 'সেটাকে ঠেকাতে পারতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রশ্ন হলো—তিনি একটু শক্ত হলেন না কেন? কেন গান্ধী ও অন্যান্যদের ওপর চাপসৃষ্টি করলেন?' ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কেন ট্যাণ্ডন—কিচলুদের মতো বিরোধিতা করলেন না? কেন ভোটদানে বিরত রইলেন না?

৪. তিনি বরং প্রস্তাবটা সমর্থন করেছেন এবং দেশভাগের ব্যাপারে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—শরীরকে বাঁচানোর জন্য একটু অঙ্গচ্ছেদ দরকার—'it would be better to cut of a diseased limb'—(এম. চলাপতি রাউ—জওহরলাল নেহরু, পৃঃ ১২০)। এই অস্ত্রোপচারে তাঁর ভূমিকাটা অস্বীকার করব কেমন করে?

৫. আসলে, তখন তাঁর বয়স ছিল ৭৭, নেহরুর ৫৭। তাঁদের মনে হয়েছিল—দ্রুত কারাবাস ও পুলিশী শাসনের বিনিময়ে কি পাওয়া গেল—একটু গদির স্বাদ মিলবে না জীবনে? মস্লেকে নেহরু বলেই ফেলেছেন—'We were tired men...if we had stood out for a united India as we wished it, prison obviously awaitad us'—(দ্য লাস্ট ডেজ অফ দ্য বৃটিশ রাজ, পৃঃ ২৮৫)। এই কারণে অধ্যাপক শ্যামলেশ দাস মন্তব্য করেছেন, গান্ধী তাঁর ক্ষমতালোলুপ সাক্রেদদের দ্বারা দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন—(ভারতবিভাগ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় নেতৃত্ব, পৃঃ ৭৪)। এই কথাটা কি মিথ্যে?

শ্রী ঘোষ প্যাটেলের ছবিকে পুজো করুন—সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু অন্য কয়েকটা কথা বলি।

প্রথমত, বিদেশে মৃত্যুর আগে তাঁর দাদা বিঠলভাই প্যাটেল সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগব্রত দেখে বিদেশে ভারতবর্ষ-সম্পর্কিত প্রচারের জন্য তাঁকে এক লাখ টাকা দিয়েছিলেন। সর্দার প্যাটেল মামলা করে সেই টাকা ফেরত নেন। সেটা তিনি অবশ্য কংগ্রেস তহবিলে দান করেছেন। তবে ইঙ্গিতটা ছিল—এবার নিশ্চয় টাকাটার সদগতি হবে। অর্থাৎ সুভাষ সেটা আত্মসাৎ করতেন! দ্বিতীয়ত, গান্ধীজীর সুভাষ-বিরোধিতায় প্যাটেল ছিলেন প্রধান সহচর। ১৯৩৬ সালে প্যাটেলরা কংগ্রেস সভাপতি নেহরুর পেছনে লেগেছিলেন—বাধ্য হয়ে নেহ্রু গান্ধীর আশ্রয় নেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালে এই অবস্থায় সুভাষ পদ-গৌরবটাকে ছুঁড়ে ফেলে 'নেতাজী' হওয়ার দিকে এগিয়েছেন। তৃতীয়ত, শ্রী ঘোষ প্যাটেলের পদ-অনীহার কথা বলেছেন। ১৯৫০ সালে তাঁর দিকের ট্যাণ্ডন নেহরুপন্থী কৃপালনীকে পরাজিত করেই সভাপতি হন। নেহরুর চাপে অবশ্য তাঁকে সরে যেতে হয়—(রজনী কোঠারী—পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৬৯)। তখন প্যাটেল সরে যাননি কেন? চতুর্থত, কাশ্মীর যুদ্ধের সময় প্যাটেল চেয়েছিলেন আমাদের সেনাবাহিনী পুরো কাশ্মীর হাতে আনুক। নেহরু তা হতে দেননি। সেক্ষেত্রে প্যাটেল পদত্যাগ করেননি কেন?

শ্রী ঘোষের গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে সেলাম জানাই। কিন্তু একটা কথা—বক্তব্যকে কঠোর শাসনে বিষয়বস্তুর চার দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে হয়। তা না হলে বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিয়েও কোনও লাভ হয় না।

—নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, বাঘাযতীন, কলকাতা-৯২।

ঘোলাজলের মাছ শিকারীরাই আপোষ-মীমাংসার বিরুদ্ধে

অতীন দাস

এক তরফা কাজির বিচারকে যারা এখনও সর্বোত্তম ব্যবস্থা হিসেবে মনে করে, সর্বজনগ্রাহ্য পঞ্চায়েতি সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া অবশ্যই কষ্টকর। অযোধ্যার বিবাদগ্রস্ত রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ ধাঁচা সংক্রান্ত এলাহাবাদ হাইকোর্টের সুচিন্তিত রায় বেরুবার পর বিভিন্ন মহল থেকে যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হচ্ছে, তা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অযোধ্যার রাম জন্মভূমি সংক্রান্ত বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে ১৫২৭ সাল থেকে। সরযু নদীর তীরে সূর্যবংশীয় রাজাদের রাজধানী অযোধ্যা হিন্দুদের নিকট খুবই পবিত্রভূমি। তাদের বিশ্বাস এখানেই রাজা দশরথের পুত্র মর্যাদাপুরুষোত্তম রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। রামচন্দ্রকে স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ বিষ্ণুর দশাবতারের এক অবতার হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং রামচন্দ্র, হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাস এবং জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত।

বিজাতীয় আক্রমণকারীরা যখন কোনও দেশ দখল করেছে— তখন বিজিত জাতির ধর্ম-সংস্কৃতির উপর আক্রমণ করেছে, ঐতিহ্যের বস্তুগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে। বর্বর আরব জাতির নেতৃত্বে ইসলামের জয়যাত্রা যখন শুরু হয়, এর মাত্রা তখন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। বিধর্মীদের উপাস্য দেবতা এবং তাদের মন্দির ধ্বংস করাকে ধর্মের অংশ হিসেবে যখন প্রচার করা হয়, তখন রাজশক্তিতে মদমত্ত বর্বররা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে সুলতান মাহমুদ থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত এই পরম্পরা রাজকীয় উদ্যোগেই চলেছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে যখন সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে তখনও ধর্মস্থান আক্রমণ, মূর্তি ভাঙা এবং উপাসনাস্থল অপবিত্র করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আফগানিস্তানে তালিবানী শাসনে বামিয়ানে বুদ্ধ মূর্তি ভেঙে দেওয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে এখনও নানা অজুহাতে মন্দিরে আক্রমণ, দেবোত্তর সম্পত্তি দখল এবং মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটে।

বাবর কর্তৃক ভারত দখলের পর সেই ঘটনাই ঘটেছে। মুসলমান বিজেতাদের পরম্পরা অনুযায়ী বিজিত জাতির ধর্ম-সংস্কৃতির উপর আক্রমণ নেমে এসেছে। বাবরের সেনাপতি মীর বাঁকী সরযু তীরে অযোধ্যার রাম জন্মভূমি হিসেবে পূজিত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে। এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপরেই মসজিদ তৈরি করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের বিচারপতিরাও এই প্রমাণ মেনে নিয়েছেন।

এই মন্দির ধ্বংস এবং মসজিদ তৈরির পেছনে যে মানসিকতা কাজ করেছে তাতে ধর্মের চেয়ে রাজনীতির হিসেবটাই হচ্ছে মুখ্য। বিজিত জাতির মানসিক শক্তি তথা 'মরাল'কে ধ্বংস করার জন্যেই এটা করা হয়। মুসলমানরা যেখানে গেছে সেখানেই এটা করা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তাদের এ কৌশল সম্পূর্ণ সফল হয়নি। ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিষ্ঠুর শাসন চালিয়েও হিন্দুর ধর্ম সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। হাজার প্রতিবন্ধকতা এবং রাষ্ট্রীয় অত্যাচার সত্ত্বেও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রয়েছে, 'জিজিয়া করের' মত বর্বর ব্যবস্থা চালিয়েও ধর্মান্তরকরণে তেমন সাফল্যলাভ করা যায়নি।

জনমত

রাম-জন্মভূমিকে উদ্ধার করার জন্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে মোগল আমল থেকেই। ছোটখাট চারশ'টি সংঘর্ষ হয়েছে। মসজিদ বলে কথিত ধাঁচায় হিন্দুরাও যে আরাধনা করে এসেছেন ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি এস ইউ খান তার রায়ে এর উল্লেখ করেছেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর একটা মীমাংসা হবে, দেশবাসী তা আশা করেছিল। কিন্তু তা হয়নি। যিনি করতে পারতেন, তাঁর আয়ু যে সুযোগ দেয়নি। স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির যেভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গড়ে দেওয়া হয়েছিল অযোধ্যার রামমন্দিরের বিষয়টিও এভাবে সমাধান করা যেত। কাশী এবং মথুরার বিবাদাত্মক বিষয়ের মীমাংসাও এভাবেই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্যে সরকার সে দায়িত্ব পালন করে না। সব কিছু ঠেলে দেওয়া হয় আদালতের উপর। রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিবাদটিও এভাবে ষাট বছর ধরে আদালতে বিচারের অপেক্ষায় ছিল। ত্রিশ সেপ্টেম্বর তিন বিচারপতি এর রায় ঘোষণা করে—বিবাদটিকে একটি নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে গেছেন। বিবাদাত্মক জমিটিকে তিনভাগ করে রাম জন্মভূমি ন্যাস, নির্মোহী আখড়া এবং সুন্নী বোর্ডকে প্রদান করতে বলা হয়েছে।

এই রায়কে দেশবাসী সামগ্রিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু কিছু মুসলিম সংগঠন, বামপন্থী এবং সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দল, যারা মুসলমান ভোট ব্যাঙ্ক নির্ভর রাজনীতি করে ও তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ উগ্রবাদীরা' (সেকুলার এক্সট্রিমিস্ট)-এর বিরোধিতা করছেন। কেউ কেউ এমনও বলছেন যে রায়ে আইন এবং ইতিহাস থেকে বিশ্বাসকেই বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপিল জানানো হবে।

গণতান্ত্রিক দেশে এ সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ধরা যাক— সুপ্রিম কোর্ট যদি রাম জন্মভূমি ন্যাসকে জমির সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে দেয়— তখন কী হবে, অথবা সুপ্রিম কোর্ট সুন্নী বোর্ডের পক্ষে রায় ঘোষণা করে রামলালাকে অপসারণের নির্দেশ দেয় তখন কী তা কার্যকর করা সহজসাধ্য হবে?

বিরোধ জিইয়ে রেখে যারা নিজেদের ন্যস্ত স্বার্থ কায়েম রাখতে চায়—এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের দায়িত্বহীন বিরোধিতায় নেমেছে তারাই।

পরম্পরা

সাড়ে চারশো বছরের প্রাচীন ময়নার রাস

মিঠু মাইতি

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমার ময়নার রাস উৎসব হচ্ছে প্রায় ৪৫০ বছরের পুরাতন। এই রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে ময়নাসহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উৎসাহ ও উদ্দীপনার শেষ নেই। সব ধর্মের মানুষ এই উৎসবের শরিক হয়। এই প্রাচীন রাস উৎসবের সূচনা করেন ময়নার রাজপরিবার। ময়নার রাজপরিবার হচ্ছে 'বাহুবলীন্দ্র' পদবীধারী। কথিত আছে, ময়নার রাজপরিবার যাঁরা পূর্বে 'সামন্ত' নামে পরিচিত ছিলেন তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। এঁদের কুলদেবতা শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউই হচ্ছেন ময়নার রাস উৎসবের কেন্দ্র বিন্দু তথা মূল আকর্ষণ।

রাজপরিবার ঃ

মধ্যযুগে ময়না ছিল উৎকল (বর্তমানে ওড়িশা) রাজ্যভুক্ত। গোটা উৎকলের দণ্ডপাটের সংখ্যা ছিল ৩১। এর মধ্যে ৬-টি ছিল মেদিনীপুর জেলার সীমানাধীন। এই ৬টি দণ্ডপাটের একটি হ'ল জলৌতি দণ্ডপাট। এই জলৌতি দণ্ডপাটের ছিল তিনটি পরগণা। এরা হ'ল— পিংলা, সবং এবং ময়না।

১৪০৩ খৃস্টাব্দে কপিলেন্দ্র দেব উৎকলের সিংহাসন অধিকার করেন এবং পরবর্তীকালে ১৪৩৪ খৃস্টাব্দে তাঁরই অধস্তন সেনানায়ক কালিন্দীরাম সামন্ত (১৪৩৪—১৪৫৩) সবং থানার কপালেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত বালিসীতাগড়ে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই বর্তমান 'বাহুবলীন্দ্র' বংশের আদি পুরুষ। ১৫৬১ খৃস্টাব্দে জলৌতি দণ্ডপাটের শাসনকর্তা গোবর্ধন সামন্ত (১৫৬১—১৬০৭) বালিসীতাগড় থেকে রাজধানী ময়নাগড়ে স্থানান্তরিত করেন। গোবর্ধন সামন্ত ছিলেন কালিন্দীরাম সামন্ত বংশের ষষ্ঠ পুরুষ। তাঁর শৌর্য, বীরত্ব ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার জন্য উৎকলরাজ মুকুন্দদেব হরিচন্দন তাঁকে 'রাজা', 'আনন্দ' ও 'বাহুবলীন্দ্র' উপাধি দান করেন। গোবর্ধন সামন্ত ময়নাগড়েই পুরুষানুক্রমে বসবাস শুরু করেন।

বর্তমানেও এই রাজপরিবার ময়নাগড়েই পুরুষানুক্রমে বসবাস করছেন। তবে আগের সেই রাজসিক ব্যাপার-স্যাপার বা ঠাটবাট নেই। অতীত গরিমা-সমৃদ্ধ ময়নাগড় তাঁদের অস্তিত্ব বহন করে চলেছে মাত্র। প্রসঙ্গক্রমে জানাই ময়নাগড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাঢ় বাংলার জাতীয় কাব্য ধর্মমঙ্গলের কিংবদন্তী নায়ক লাউসেনের শৌর্য-বীর্যের কাহিনীও। আনুমানিক দশম শতাব্দীতে ময়নাগড় নাকি লাউসেনের রাজধানী ছিল। তাই ময়নাগড়কে 'লাউসেনের গড়' নামেও ডাকা হয়।

ময়নাগড়—সব ধর্মের সহাবস্থান ঃ

ময়নাগড় দুটি পরিখা দ্বারা বেষ্টিত একটি দ্বীপের মতো। পরিখা দুটি হচ্ছে কালীদহ এবং মাকড়দহ। কালীদহ দৈর্ঘ্যে ৩০০০ ফুট এবং প্রস্থে ১৬৫ ফুট। মাকড়দহ দৈর্ঘ্যে ৫৫৪৪ ফুট এবং প্রস্থে ১৬৫— ২০০ ফুট।

মাকড়দহ পরিখাটি বর্তমানে আংশিক লুপ্ত। এই গড়টির মধ্যে আছে বৈষ্ণব-শৈব-শক্তি ও ইসলাম ধর্মের সহাবস্থান। যেমন আছে শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ ও শ্রীরাধিকার মন্দির, তেমনি ময়নাগড়ের চৌহদ্দির মধ্যে লোকেশ্বর শিব মন্দির, মহাকালী রুক্মিনী মন্দিরও আছে। দেখা যায়, শালগ্রাম শিলা রাজ রাজেশ্বর, (তিরোভাব ১৭১০ খৃস্টাব্দ) ধর্মঠাকুরের (যাত্রাসিদ্ধি রায়) পীঠস্থান, মোহন্ত নয়নানন্দদেব গোস্বামীর সমাধি মন্দির এবং তিনশো বছরের পুরাতন মানিক পীরের দরগা।

ময়নার রাস উৎসব শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউকে কেন্দ্র করেই। প্রতিবছর বাংলা কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমা তিথিতে রাস উৎসবের সূচনা হয়। রাসমঞ্চে শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ আসেন রাস পূর্ণিমা তিথির উত্থান একাদশীর দিন ভোরবেলায়। একটা সময় উত্থান একাদশী থেকে পাঁচদিন ধরে শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউর বিশেষ পুজো হতো। বর্তমানে একাদশী থেকে টানা আট দিন ধরে এই পুজো হয়ে আসছে। এই বিশেষ পুজোকে ঘিরেই রাস উৎসব, যা পরে রাসমেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই রাসমেলা হয় ময়নাগড়ের অপর পাশে থাকা রাসমঞ্চে ।

এই রাসমেলার জন্মকাল সঠিক জানা যায়নি। তবে রাজ রাধেশ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্রের (১৮২২—১৮৮৩) সময় থেকেই রাসমেলাটি প্রসিদ্ধি অর্জন করে। মেলা চলে বাইশ দিন থেকে একমাস।

নৌ-রাসযাত্রা ঃ

উৎসবের দিনগুলিতে ময়নাগড় থেকে শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউয়ের বিগ্রহ আলোক মালায় সজ্জিত নৌকায় কালীদহ পরিভ্রমণ করে রাসমঞ্চে আনা হয়। আবার পুজোর শেষে মূল মন্দিরে বিগ্রহের প্রত্যাবর্তন ঘটে।

ময়নাগড় থেকে শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউর রাসমঞ্চে আনার আয়োজনটা বিশাল। দুটি নৌকা জোড়া দিয়ে 'ভড়' তৈরি করা হয়। ভড়ের উপর সুসজ্জিত মন্দির। মন্দির আলোকমালায় সজ্জিত। এই সুসজ্জিত ভাসমান মন্দিরে থাকেন শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ ও তাঁর দুই রাই, মদনমোহন ও তাঁর রাই, ব্রজকিশোর ও তাঁর রাই, দোলগোবিন্দ ও তাঁর রাই এবং কানাই ও বলাই। এঁরা একত্রে রাসযাত্রা করেন। এই যাত্রায় সঙ্গে থাকে কীর্তনের দল, ঢাকের দল, নহবতের দল এবং শাঁখ, কাঁসর ও ঘণ্টা বাজানোর দল। আর থাকে হরেকরকম আতসবাজি পোড়ানোর খেলা এবং বর্ণাঢ্য ফানুস ওড়ানোর প্রতিযোগিতা। সব মিলিয়ে জলের উপর এই শোভাযাত্রা মনলোভা ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে। এই সুখদৃশ্য চাক্ষুষ করার জন্য হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত থাকেন। কালীদহ ও মাকড়দহের জলে ভাসতে ভাসতে প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে আধ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে শোভাযাত্রা এক সময় রাসমন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়। পরে পুজোর শেষে শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউর প্রত্যাবর্তন ঘটে মূল মন্দিরে।

ময়নাগড়ের কাছেই আছে একটি গ্রাম— গড় সাফাৎ। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। রাসমন্দির এই গ্রামেই, রাসমন্দিরের লাগোয়া জায়গায় হয় রাসমেলা। যাকে বলা যেতে পারে হিন্দু-মুসলমানের মিলন মেলা। প্রায় চার একর জায়গা জুড়ে চলে রাসমেলা। থাকে ছোটো ও বড়ো নানা ধরনের স্টল। স্থানীয় অঞ্চলের মৃৎ শিল্প, তাঁত শিল্প, মাদুর শিল্প প্রভৃতি প্রদর্শিত ও বিক্রীত হয়। বিশেষ করে সবং-এর বিখ্যাত 'মাদুর', কিয়ারানা গ্রামের মহিলাদের তৈরি 'হুডুম' এবং মুড়ি-মুড়কি এই রাসমেলার প্রধান আকর্ষণ।

১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এই রাসমেলাটি রাজবাড়ির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হোত। ১৯৭০ সালে এই মেলাটির পরিচালনার দায়িত্ব জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে সেবাইতের ভার রাজবাড়ির হাতে থেকে গেছে। রাজপরিবার রাস উৎসবের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে না পারায় এই হস্তান্তর। হস্তান্তর উত্তর-পর্ব থেকেই হিন্দু ও মুসলমান— উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ দিয়ে এবং হাতে হাত মিলিয়ে এই মেলার গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছে উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে। হিন্দুদের মতো মুসলিমরাও রাসমেলা উদ্‌যাপন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন।

রাজা দশরথ ও চিলাপাঙ্গে

সপ্তকাণ্ড রামায়ণের একটা কাণ্ড ও লেখা হোত না যদি না রাজা দশরথ ভুল করে অন্ধমুনির ছেলে সিন্ধুকে মেরে ফেলতেন। লিখেছেন—নির্মল কর

রাজা দশরথ ছিলেন ভাল রাজা, দক্ষ তীরন্দাজ। দূর থেকে বুনো জন্তু-জানোয়ারদের আওয়াজ শুনেই ঘায়েল করতে পারতেন শব্দভেদী বাণ দিয়ে। একদিন অন্ধমুনির ছেলে সিন্ধু অরণ্যের এক জলাশয় থেকে কলসিতে জল ভরছিল। সেই শব্দ শুনে তিনি ভাবলেন, কোনও বন্য প্রাণী বুঝি জল খাচ্ছে। রাজা তক্ষুণি শব্দভেদী বাণের আঘাতে তাকে হত্যা করলেন। পুত্রশোকে অন্ধমুনি দেহত্যাগ করলেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে এই ব'লে অভিশাপ দিয়ে যান যে, তাঁরই মতো দশরথকেও পুত্রশোকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। ফলে অপুত্রক দশরথ পুত্রলাভ করেন এবং কালক্রমে রামায়ণের কাহিনি গড়ে ওঠে। রাজা যদি ভুল করে অন্ধমুনির ছেলেকে হত্যা না করতেন, তাহলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের একটি কাণ্ডও লেখা হোত না।

রাশিয়ার নানাই উপকথার একটি গল্পেও পাওয়া যায় এরকমই এক শব্দভেদী তীরন্দাজের সন্ধান। তার নাম চিলাপাঙ্গে। দশরথের মতো চিলাপাঙ্গেও দূর থেকে বন্য জন্তু-জানোয়ার শিকার করতে পারত আওয়াজ শুনেই। তারও নিশানা ছিল অব্যর্থ। তবে রামায়ণের কাহিনির সঙ্গে নানাই-উপকথার কোনও মিল নেই। সেটা নেহাৎই আমাদের রূপকথার ধাঁচের একটা গল্প।

একদিন চিলাপাঙ্গে বনে শিকারে গিয়ে শুনতে পায় হরিণের ডাক। মুহূর্তেই সে বাণ মেরে তাকে ঘায়েল করে। পরক্ষণেই চিলাপাঙ্গের ভুল ভাঙে। আরে, এতো হরিণ নয়! কাছে গিয়ে বুঝতে পারল, হরবোলার মতো হরিণের গলা নকল করে হরিণের দলকে কাছে টানার চেষ্টা করছিল আর এক শিকারী। চিলাপাঙ্গে এই শিকারীকেই ভুল করে হত্যা করে। অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগল সে।

ঘটনার অনেকদিন পরে হরবোলা ওই শিকারীর একমাত্র মেয়ে বাবার মৃত্যুর কারণ জানতে পারে পাড়াপড়শিদের মুখে। তক্ষুণি সে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প নেয়। একদিন সে পুরুষের সাজে সেজে একটি নৌকোয় চেপে অমুর নদী বেয়ে এগোতে থাকে চিলাপাঙ্গের গাঁয়ের উদ্দেশ্যে। পথের কোনও বিপদাপদকে গ্রাহ্য করে না সে। বন্ধুদের প্রলোভনেও কান দেয় না। অবশেষে চিলাপাঙ্গের দরজার সামনে এসে ধনুকে তীর জুড়ে চিৎকার করতে থাকে—'কোথায় রে চিলাপাঙ্গে! বেরিয়ে আয় সামনে। আমি বাবার হত্যার শোধ নিতে এসেছি।'

বাইরে হাঁকডাক শুনে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে বলল, 'আমিই চিলাপাঙ্গে। আমি ভুল করে তোমার বাবাকে মেরেছি এবং সেজন্যে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি। তুমি আমাকে মেরে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নাও।'

বৃদ্ধের কথা শুনে মেয়েটির হাত থেকে তীর-ধনুক খসে পড়ল। খানিকক্ষণ বিহ্বলের মতো বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'না, তুমি ভুল করে আমার বাবাকে মেরেছ। সেকথা জানতে পারলে অত দূর থেকে প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসতাম না। তাছাড়া তুমি বড্ড বুড়ো।'

এখানেই গল্পের শেষ হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। এদেশের রূপকথা-উপকথার গল্পের মতো নানাই উপকথার এই গল্পেরও একটা সুন্দর সমাপ্তি আছে। পথের নানা বাধাবিঘ্নে মেয়েটিকে সাহায্য করেছিল এক রূপবান যুবক। তাকে বিয়ে করে সে ঘরে ফিরল মায়ের কাছে।

এ ধরনের গল্পের যে নিজস্ব একটা মজা আছে, তার ফাঁক-ফোঁকরে লুকিয়ে আছে অতি প্রাচীন কালের মানুষদের বেঁচে থাকার বহু খবরাখবর। যেমন, এ গল্পে পাওয়া গেল শব্দভেদী বাণের কথা, খাদ্যের জন্যে হরিণ শিকারের কথা। পশুপাখির ডাক নকল করে এখন হরবোলারা কত মজার কাণ্ডই না ঘটাচ্ছে। সেই কৌশলটাও আদ্যিকালের মানুষেরা আয়ত্ত করেছিল বহু আগে। রাজা দশরথের আগেও হয়তো তারা শব্দভেদী বাণের ব্যবহার জানত। তাও কি কম বিস্ময়ের!

সমৃদ্ধ ভারত

নবাঙ্কুর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাল্টেছে সময়। বদলেছে মানুষের চাহিদা। বদলেছে আজকের ভারতবর্ষ। নিত্য প্রয়োজন থেকে বিনোদন সর্বত্রই ঘটেছে এক নতুন বিপ্লব। পাশ্চাত্য দেশগুলোর তুলনায় আজ কোনও অংশে পিছিয়ে নেই ভারতবর্ষ। দেশ-বিদেশের বহু বিনিয়োগকারী সংস্থা আজ ঝুঁকে পড়েছে ভারতের বাজারে। ভারতীয়দের 'লাইফ স্টাইল' বদলে দিয়ে গড়ে উঠেছে একের পর এক মাল্টিপ্লেক্স, শপিং মল, রিটেল আউটলেট।

একটি ইংরাজি পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে যদি ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে ৮ শতাংশ বৃদ্ধি লাভ ঘটে, তাহলে ২০২০ সালের মধ্যে দেশের রিটেল মার্কেটে বা খুচরো বাজারে ঘটবে এক ব্যাপক পরিবর্তন। প্রায় ৯০০-১০০০ বিলিয়ান ডলার বিনিয়োগ করা হবে এই ক্ষেত্রে। তবে রিটেল মার্কেটের বাড়বাড়ন্তের দৌলতে পিছিয়ে নেই অনলাইন শপিংয়ের আকর্ষণও। ২০১৫ সালের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা আছে এই ক্ষেত্রে। 'লাক্সারি কার মার্কেট' বা গাড়ির বাজারেও প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি ডলারই খরচ হয় খাদ্যের পিছনে। খনিজ জলের উৎস (যা দিয়ে সোডা-লেমনেড প্রভৃতি পাওয়া যায়)-এর ক্ষেত্রেও চোখে পড়েছে এক আমূল বাড়বাড়ন্ত। দেশের বাজারে যার আর্থিক মূল্যায়ন হচ্ছে ১১

ঘটেছে ভারতবর্ষে। ছোট গাড়ির ক্ষেত্রেও প্রায় ১৫ থেকে ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে।

প্রত্যেক বছর ফ্যাশানের ক্ষেত্রে প্রায় ৩৩ বিলিয়ন ডলার খরচ হয় ভারতবাসীদের পকেট থেকে। এর মধ্যে প্রায় ২১৭ বিলিয়ন হাজার কোটি টাকায়। দেশের পরিষেবা সংস্থার নিরীখে এগিয়ে আছে ভ্রমণ সংস্থাগুলো। জি ডি পি-তে ভ্রমণ সংস্থাগুলো অংশগ্রহণ প্রায় ৬.২ শতাংশ। অর্থাৎ পর্যটন শিল্পেও দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত।

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

স্ট্রেস কমাতে হ্যাপি প্ল্যান্ট

দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ ৪০০ বছর ধরে নানা রোগহর এক বিশেষ গাছের পাতা চিবিয়ে খাচ্ছেন আর দূরে সরিয়ে রাখছেন মানসিক অবসাদ, ক্ষুধামান্দ্যের মতো নানা ব্যামো। ১৯৮৫ সালে এই গাছটির দিকে নজর পড়ে নিউজার্সির এক ওষুধ কোম্পানির বিজ্ঞানী গ্রেক-এর। আজকের সমস্যাসংকুল উন্নত দেশগুলির মানুষের নিত্যসঙ্গী 'স্ট্রেস' বা মানসিক চাপ। গ্রেক গবেষণা করে দেখলেন, ওই গাছের পাতার অনেক গুণ। বিজ্ঞানীরা গাছটির নামকরণ করেছেন 'হ্যাপি প্ল্যান্ট'। ওই গাছের পাতা চিবানোর পর যে-কেউ 'অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ মুক্ত হবেন, কাজে উৎসাহ বাড়বে, ক্ষুধা বাড়বে এবং সবসময় স্ফূর্তিতে থাকবেন'।

হাতির আশীর্বাদ আর নয়

প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত 'হাতির আশীর্বাদ' প্রথা খুব তাড়াতাড়ি নিষিদ্ধ হতে চলেছে তামিলনাড়ুতে। চালু প্রথা অনুযায়ী তামিলনাড়ুর মন্দিরে ভক্তদের মাথায় শুঁড় বুলিয়ে আশীর্বাদ করে ঐরাবতের দল। বন্যপ্রাণী দপ্তরের পক্ষে জানানো হয়েছে, হাতিদের হাঁপানি ও যক্ষ্মার মতো নানা ধরনের রোগ হয়, যা মানুষের মধ্যে সহজেই সংক্রামিত হতে পারে। তাই সরকারের এই সিদ্ধান্ত।

মুখ দিয়ে যায় চেনা

কোন্ পুরুষ কতটা দাপুটে তা আন্দাজ করতে এবার এক ঝলকই যথেষ্ট। লন্ডনের ব্রোক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক সমীক্ষা চালিয়ে জেনেছেন, যে পুরুষের মুখের অবয়ব যতটা গোলাকার, ততটাই তাঁর দাপট। তুলনায় লম্বাটে মুখের অধিকারীরা অনেকটাই সংযত। গোলাকার মুখের পুরুষদের দেহে টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বেশি থাকায় তাঁদের এত দাপট।

জলদি হাঁটুন বেশি বাঁচুন

যদি চান বেশি বাঁচতে, শুরু করুন হাঁটতে। তবে পা চালিয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে করমর্দন করুন হাত ঝাঁকিয়ে। এটা সাম্প্রতিক বিশেষজ্ঞদের সমীক্ষার রায়, যাঁরা দ্রুত হাঁটেন, ধীরগামীদের তুলনায় তিনগুণ কম তাঁদের আগে মৃত্যু-সম্ভাবনা। যাঁরা শক্ত মুঠোয় হাত মেলান, অন্যদের তুলনায় দেড়গুণ বেশি তাঁদের বাঁচার সম্ভাবনা।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম ।। ১৫

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

রবি ঃ (জাদুঘরে মমি দেখে) লোকটার সারা গায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা কেন বল তো?

অভি ঃ নির্ঘাত ট্রাকের ধাক্কা খেয়েছিল।

রবি ঃ ঠিক বলেছিস। ট্রাকের নম্বরটাও নিচে লিখে রেখেছে বি সি, ১৭৬০।

* * *

—পশ্চিমবঙ্গে আজকাল বাঙাল-ঘটির তেমন রেষারেষি দেখা যায় না কেন বলতো?

—এখন সবাই ধর্মঘটি হয়ে গেছে কি না!

* * *

সমর ঃ এখন থেকে সমঝে কথা বলবি, আমি আর বিল ক্লিন্টন সমান, বুঝলি!

অমর ঃ কী করে?

সমর ঃ আমিও আমার মেয়ের বিয়েতে ওবামাকে নেমন্তন্ন করিনি।

* * *

—আমাদের রাজ্যে নাকি হঠাৎ কিছু জুতোর কারখানা খোলা হচ্ছে! কী হবে রে এত জুতোর কারখানায়?

—শুনছি তো অনেক শিক্ষকের পদ খালি হয়েছে!

* * *

শি(ক ঃ তোমরা শিলালিপি, তাম্রলিপি বা জীবাশ্ম—যে-কোনও একটির উপর রচনা লেখ।

এক ছাত্র ঃ স্যর, আমি তো খাতা ছাড়া আর কিছুর উপর লিখতে পারি না!

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। ১৮৮৪ সালে প্রথম বাংলা ভাষায় শিল্প-বিষয়ক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কী নাম পত্রিকাটির?

২। পাঁচবার গ্রান্ডস্লাম জয়ী কৃষ্ণাঙ্গ টেনিস তারকার নাম কী?

৩। কলকাতায় আগে যেখানে পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম ছিল, সেখানে এখন কী দেখা যায়?

৪। 'যখন শ্যামাপুজোয় পাঁঠাবলি দিতে লইয়া যায়, সেই সময় পাঁঠা যেমন মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল'— লিখেছিলেন প্রথম মহিলা জীবনীকার। কে তিনি?

৫। রবীন্দ্রনাথ অভিনীত প্রথম নাটক কী?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। শিল্পপুষ্পাঞ্জলি

২। ভেনাস উইলিয়ামস্

৩। বিবাদীবাগের জি পি ও

৪। রাসসুন্দরী দেবী

৫। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এমন কর্ম আর করব না'

সনাতনী দর্শনের আলোকে রাজনীতি-ধর্ম-সমাজ

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১৪ বছর বয়সে পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে স্কুলে পড়াশুনা শুরু হয়েছিল। তদানীন্তন রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে ধারণা একেবারেই ছিল না। একে প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেবেলা, তার উপরে সবেমাত্র ক্লাস এইটের ছাত্র এবং সবার উপরে অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত 'দিন আনে দিন খায়' জাতীয় পরিবার সুতরাং ধর্ম, রাজনীতি নিয়ে চিন্তার কোনো প্রশ্নই আসে না। তা সত্ত্বেও কলকাতা আসার কিছুদিনের মধ্যে যখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় মারা গেলেন কেমন যেন ভিতর থেকে তাগিদ এসেছিল— শোকযাত্রায় যোগদান করতে হবে। কয়েক বছর বাদে জওহরলাল নেহরু মারা গেলেন— একা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে চোখে জল এসে গিয়েছিল— ভারতবর্ষের এখন কি হবে? নেহরুর অবর্তমানে দেশটা বাঁচবে তো।

অবশ্যই এসব অনুভূতি আবেগপ্রসূত, কোনো সমাজ বা রাজনীতি সম্পর্কিত ধারণার ভিত্তিতে নয়।

গ্রামের বাড়ীর নিত্যকার নারায়ণ পুজো— বছরে বিভিন্ন সময়ে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, সরস্বতীপুজো ইত্যাদিতে আনন্দ করা— এগুলোকে যদি ধর্ম বলা যায়, তবে ধর্মের সঙ্গে পরিচিতি এবং প্রয়োজনীয়তা ওই পর্যন্তই। আর সমাজ? সে তো এক কঠিন শব্দ। বড় হয়েও সেটা বোঝা হয়নি। সম্পূর্ণ ছোটবেলায় তো আরও দুর্বোধ্য ছিল বিষয়টা। সাধারণ জীবনের দৈনন্দিনতার সঙ্গে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ষাটের দশকের প্রথমদিকে কলকাতার বাঙ্গালীকে যখন গমের বদলে মাইলো বিতরণ শুরু হলো তখন নিতান্ত অরাজনৈতিক বালকের মনেও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটল। স্বাভাবিক কারণেই তদানীন্তন সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব ধীরে ধীরে সমস্ত যুক্তি তর্কের ওপরে স্থান পেল। সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজে একটা কম্যুনিস্ট আন্দোলনের হাওয়ায় কিশোর মন উত্তেজনা আর নতুন চিন্তার স্বাদ পেতে আরম্ভ করল। সভ্য ভদ্র সুশিক্ষিত কংগ্রেস সমর্থকদের যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তাও অযৌক্তিক আর অসত্য বলে মনে হতে লাগল। অপর পক্ষে অপরিণত, অন্ধবিশ্বাসী তরুণ কম্যুনিস্ট ছাত্র নেতার বক্তব্যে আমার মতো বহু কিশোর মন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ল।

স্বাভাবিক কারণেই সমাজ কি, সামাজিক পরিবর্তন দরকার কেন, সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নিজ নিজ দায়িত্ব, কর্তব্য কি— এসব নিয়ে চিন্তার সূত্রপাত তখন থেকেই। সেই খোঁজ এখনও চলছে। ছাত্র বয়সে সেটা ছিল ভাবালুতা— এখন পরিণত বয়সে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যন্ত্রণা। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি সব কেমন একের পর একটা চেপে বসে মনের গভীর অন্ধকার কূপের মধ্যে প্রতিনিয়তই ঘুরপাক খাচ্ছে— আর মনকে ক্রমাগত অস্থির করে তুলছে। এই কলম ধরা হয়ত এই অস্থিরতা থেকে মুক্তির একটা ছোট্ট প্রয়াস।

যাই হোক, আবার ফিরে আসা যাক সেই স্কুল কলেজের দিনগুলোতে। ভগবান কি শালগ্রাম শিলা না দুর্গাপ্রতিমা না কালীমূর্তি এই জিজ্ঞাসা মনে অনেকদিনের। রামকৃষ্ণের ঐশ্বরিক চেতনা, বিবেকানন্দের মানবতাবাদী ধর্মচিন্তা— একদিকে যেমন মনের মধ্যে উকিঝুঁকি দেয় তেমনি লেনিন মাও সে তুং-এর 'ধর্ম' এবং আদ্দিমের মধ্যে অভেদবোধ— ঈশ্বর অবিশ্বাসীর বাস্তববোধ মনের মধ্যে তোলপাড় করে।

ষাটের দশকের শেষের দিকে, সত্তরের গোড়ায় আর এক ধরনের কম্যুনিস্ট আন্দোলন মাথাচাড়া দেয়— নক্সালিজম। নক্সালিজম-এর প্রবক্তারা খুব মেধাবী ছেলেমেয়ে, নিজেদেরই বন্ধু-বান্ধব তাই খুব সহজেই আকর্ষণ বোধ হয়। কিন্তু যখন নিজের ফাইনাল ইয়ারের ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা নক্সাল আন্দোলনের কারণে পিছিয়ে যেতে থাকে— তখনই নক্সাল ভাবনা চিন্তার সঙ্গে বিরোধ বাধে। তার থেকেও বেশি অনীহা জন্মায় যখন তথাকথিত নক্সালদের হাতে বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গা শুরু হয়। নক্সাল আন্দোলন এখনও কোথাও কোথাও বর্তমান কিন্তু প্রথমদিকের সেই বৌদ্ধিক চেতনা প্রসূত কিছু কিছু শিক্ষিত জনমানসের নীরব এবং সোচ্চার সমর্থন এখন আর একেবারেই অনুপস্থিত। কলেজের শেষ বছরগুলিতে কম্যুনিস্ট ছাত্রবন্ধুদের স্বার্থান্বেষী মনোভাব আর নক্সালপন্থীদের ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ আমার নিজের অনুভূতিকে পীড়িত করে।

এইভাবে কংগ্রেস কম্যুনিস্ট নক্সাল সব কিছু মনের মধ্যে এলোপাথারী ঘুরতে থাকলেও কিছুই ঠিক স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধতে পারে না। সবকিছুর মধ্যেই গভীরতায় খুব অভাব মনে হয়। তবুও সবকিছু মিলিয়ে কলেজের দিনগুলোতে মনের পাল্লা সরকার বিরোধী সমাজতন্ত্রের দিকেই বেশি ভারি ছিল।

কলেজ পেরিয়ে চাকরী জীবনে প্রবাসে অফিসের বাইরে অঢেল সময়। স্বভাবগত কারণে কোনদিনই নিজের চিন্তা ভাবনার অংশীদারী কোনো বন্ধুবান্ধব প্রায় ছিলই না। তাই রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীতে পরিচয় হলো বেদ, উপনিষদ, কোরান হাদিসের সহজ পাঠের সঙ্গে। হঠাৎ মনে হলো স্কুল কলেজে সামান্য যে বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতি ছিল তার সঙ্গে বেদ, উপনিষদের বক্তব্যের কোথাও একটা মিল আছে। মিলটা যথাযথ ভাবে না বুঝতে পারলেও এদের সঙ্গে যে কোনো অমিল নেই সেটা বুঝতে আরম্ভ করলাম। ভাবতে লাগলাম ধর্ম কি? মার্ক্স এঙ্গেলস যে ধর্মকে আফিম মনে করেছেন বেদ উপনিষদের সঙ্গে তো তা একেবারেই মেলে না। একটা ধর্ম জিজ্ঞাসা শুরু হলো মনে। জ্ঞানেশ্বর তুকারাম-রামকৃষ্ণ— বিবেকানন্দ— শঙ্করাচার্যের ধর্ম কি আফিম?

দেখতে দেখতে চোখের সামনে কত পরিবর্তন ঘটতে লাগল। সমাজতন্ত্রের হাওয়ায় সনাতনপন্থীদের হেনস্থা আরম্ভ হলো। অনেক রাজ্যে কংগ্রেসকে পরাজিত করে কম্যুনিস্টরা সরকার গড়ল। যে রাজনৈতিক দল এক সময় পার্লামেন্টকে শুয়োরের খোঁয়াড় বলে আখ্যা দিয়েছিল, তাঁরাই হঠাৎ গণতন্ত্র আর ভারতীয় সংবিধানে পরম আস্থাশীল হয়ে গেল। হতেই পারে— সময়ের সঙ্গে অনেক মত পরিবর্তন হয়— এঁদেরও হলো। কিন্তু একই সময়ে কম্যুনিস্ট শাসক এবং সমর্থকদের স্বার্থান্বেষী দিকটা আরও প্রকট হলো। কথা আর কাজের মধ্যে পার্থক্যটা আর সন্দেহের বেড়াজালে আবদ্ধ রইল না। সর্বহারাদের নেতৃত্ব করতে করতে

ষাটের দশকের শেষের দিকে, সত্তরের গোড়ায় আর এক ধরনের কম্যুনিস্ট আন্দোলন মাথাচাড়া দেয়— নক্সালিজম। নক্সালিজম-এর প্রবক্তারা খুব মেধাবী ছেলেমেয়ে, নিজেদেরই বন্ধু-বান্ধব তাই খুব সহজেই আকর্ষণ বোধ হয়। কিন্তু যখন নিজের ফাইনাল ইয়ারের ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা নক্সাল আন্দোলনের কারণে পিছিয়ে যেতে থাকে— তখনই নক্সাল ভাবনা চিন্তার সঙ্গে বিরোধ বাধে।

কম্যুনিস্ট শাসক এবং সমর্থকদের সমাজের ধনসম্পদ আহরণের নির্লজ্জ তৎপরতা আর চাপা থাকল না। সবথেকে বড় রকমের আঘাত এল মানুষের স্বাধীন চিন্তা ভাবনার উপরে। কম্যুনিস্ট শাসিত অঞ্চলে গ্রামে গঞ্জে কোথও শিক্ষক কেরানী, উপাচার্য অথবা ঝাড়ুদার নিযুক্তি পার্টির অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভব রইল না। গণতন্ত্রের নামে চলে এল পার্টির স্বৈরাচার।

সমাজ আর রাজনীতির এই তোলপারের মধ্যে ধর্ম চিন্তাটা কেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব, সনাতন ধর্মবোধ— হিন্দু ধর্মটা কি আদৌ কোনো ধর্ম নাকি দর্শন— নাকি দ্বৈত, অদ্বৈত, সাকার নিরাকার শিবজ্ঞানে জীবসেবা— এসবের একটা খিচুড়ী তাই নিয়ে মন আন্দোলিত হতে থাকল। রবীন্দ্রনাথের ভারত তীর্থে যে শক হুন দল পাঠান মোগল— এক দেশে লীন হতে পেরেছে তার জন্য কি তথাকথিত হিন্দুধর্ম কোনও বিশেষ সম্মানের দাবী করতে পারে? হিন্দুধর্মের যে মৌলিক পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শ— সেটা কি উদারতা না দুর্বলতা— ভাবনা চিন্তার শেষ হয় না।

পেশাগত ভাবে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সুবাদে ভারতবর্ষের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ভিত্তিমূল সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারি। স্বাধীনতার প্রাক্‌কালীন শিল্পবাণিজ্যের তুলনায় সত্তর-আশি দশকের প্রগতি প্রশংসনীয়। ষাটের দশকের দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সত্তর দশকের শেষভাগে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা একটা গর্বের বিষয়। তবুও আশির দশকেও ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান, ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা অশিক্ষা আর অসুস্থ রাজনীতির জন্য প্রধানমন্ত্রী বলি হয়। দুর্নীতি চরমে ওঠে, গণতন্ত্রের নামে চলে চরম প্রহসন। একদিকে চরম ধর্মহীনতা আপাত অতিশিক্ষিত সম্প্রদায়কে করে তোলে চরম উচ্ছৃঙ্খল, অন্যদিকে ধর্ম আর রাজনীতির একটা অশুভ মিলন পাকেচক্রে দেশকে এক চরম দুর্দিনে ঠেলে নিয়ে যায়। ধর্মহীন কম্যুনিস্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গের পাব কালচার হয়ে ওঠে উচ্চমধ্যবিত্তদের সীমাহীন লাগাম ছাড়া নির্লজ্জতার প্রতীক— ছোট বড় মাঝারী কোনও হোটেলই বাদ যায় না। আবার সেই একই পশ্চিমবঙ্গ অসম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে গ্রামীণ স্কুলের মধ্যাহ্ন আহারে হালাল মাংসের আবশ্যিকতা, মাদ্রাসার মধ্যযুগীয় শিক্ষা প্রসারে সহযোগিতা- সেকুলারিজমের নামে সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা সাধারণ লোকের সুস্থ মনকে বিস্মিত করে। যে ধর্মের যূপকাষ্ঠে ভারতবর্ষ বলি হয় ১৯৪৭ সালে সেই ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা আবার মাথাচাড়া দেয়। ধর্মনিরপেক্ষতা রাজনীতির ফাঁস অকারণে সংখ্যালঘু তোষণে পরিণত হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের সহনশীলতা দুর্বলতার নামান্তর ভেবে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মের উদারতার অপব্যবহার করে। উপরতলার মানুষ লড়তে থাকে—নীচুতলার নিষ্পেষণ বেড়েই চলে। একদিকে দিল্লী গুরগাঁওকে নিউইয়র্কে পরিণত করার আপ্রাণ প্রয়াস চলে— অন্যদিকে ইতিহাস বিখ্যাত যমুনাকে আবর্জনার নালায় পরিণত দেখেও শাসক গোষ্ঠীর চরম উদাসীনতা আর অবহেলার কমতি হয় না। কিরকম একটা সার্বিক অরাজকতা সমাজকে বন্ধনহীন করে দেয়। আপাত শিক্ষিত কম্যুনিস্ট সম্প্রদায় যাঁরা ধর্মের বন্ধনকে অস্বীকার করতে শিখিয়েছিল তাঁরা নিজেরা একটা অদ্ভুত ধর্মহীনতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেদেরই বন্দী করে রেখে দিল। সমাজ এগিয়ে (?) চলল। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

অনেক সুধীজনকে বলতে শুনি ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিও না। কিন্তু সমাজ কি ধর্ম আর রাজনীতিকে পারস্পরিক সম্পর্কহীন ভাবতে পারে? যাকে আমরা এখন রাজনীতি বলি তা তো একটা সুসংগঠিত শাসনযন্ত্রের পরিকাঠামো আর সভ্যতার ঊষালগ্নে ধর্মই নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিল এই বেঁচে থাকার পথকে। কি করে রাজনীতি ধর্মকে স্থানান্তরিত করতে পারে? আইন শাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের সহায়তা করতে পারে— কিন্তু কখনোই স্থানচ্যুত করতে পারে না। ধর্মের অনুশাসনবিহীন সমাজকে রাজনীতি ধরে রাখতে পারে না।

প্রযুক্তি, শিল্প, কলা, বিজ্ঞান, সবদিক দিয়েই আজকের পৃথিবী এবং অনেকাংশে খণ্ডিত ভারতবর্ষও অনেক এগিয়ে। তবুও সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা-মানসিক ভারসাম্যের অভাবে সামগ্রিক অস্থিরতা ক্রমবর্ধমান। মানুষে মানুষে পারস্পরিক বিশ্বাস আস্থা— প্রায় পুরোপুরিভাবে অন্তর্হিত। উন্নততর বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বস্তির হদিস দিলেও সুখের কোনও আশ্বাস দিতে পারে না। জীবনের সন্ধিক্ষণে এসে আজ মনে হয় তার কারণ অন্য সকল দিকে তথাকথিত সভ্যতা এগোলেও ধর্ম অনেক পিছিয়ে। ধর্মই পারে সব রকমের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে সমাজকে একটা পূর্ব-নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রেখে দিতে যাতে করে মানুষের মন একটা সুস্থ জীবনে হদিশ্ পায়।

আসলে ধর্ম কি? ধর্ম ধৃ ধাতুর কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ। যা কিছু আমাদেরকে মানসিক স্থিরতার মধ্যে ধরে থাকে, সেটাই ধর্ম। আমার মূল্যবোধ— জীবনের প্রতি দায়ীত্ববোধ, প্রকৃতির কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ —অন্যের সমানভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে এই মর্মবোধ— এসবই আসে ধর্মীয় চেতনা থেকে। ধর্মের একটা মূল কথা পারম্পর্য্য— চলমান "বসুধৈব কুটুম্বকম"। এ ধর্ম মৌলবাদী নয়— এ ধর্ম সনাতন— এ ধর্ম স্রেফ পুজোপার্বন নয়— এ ধর্ম দর্শন। হ্যাঁ অনেকের দর্শনবোধ পূজো পার্বনের মধ্যেই আসে। যে আচার ব্যবহার অন্যকে— সে অন্য ধর্মাবলম্বীই হোক— কি অন্য রাজনৈতিক দলভুক্তই হোক, অস্বীকার করতে শেখায় সেটা ধর্ম নয়— ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা— ধর্মান্ধতা। মানুষ সমাজবদ্ধ-জীব। সামাজিক পরিবেশকে সুস্থ রাখতে হলে শৃঙ্খলা চাই— শৃঙ্খলার জন্য রাজনীতি চাই-রাজনীতি যাতে দুর্নীতি আর তোষণ নীতির নামান্তর না হয় তারজন্য ধর্ম চাই। প্রযুক্তি, শিল্প-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের বন্ধন চাই আর তার জন্য চাই প্রাচীন ভারতের সনাতন ধর্মের রক্ষাকবচ যা ধর্ম এবং দলমত নির্বিশেষে "সহ না ভবতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ"-এর সঞ্জীবনি সুধা প্রদান করতে পারে।

অদূর ভবিষ্যতে তা মেলার কোনও সম্ভাবনা দেখি না।

মৃত্যুর ত্রিশ বছর পরেও রবীন্দ্রসঙ্গীতে বেস্ট সেলার দেবব্রত বিশ্বাস

বিকাশ ভট্টাচার্য।। এই গত ২২ আগস্ট শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস শতবর্ষে পা রাখলেন। এ উপলক্ষে রবীন্দ্রসদনের মুক্তমঞ্চে দেবব্রত বিশ্বাস আকাদেমি আয়োজন করে দু-দিন ব্যাপী এক স্মরণ অনুষ্ঠানের। উপস্থিত ছিলেন ডঃ পার্থ ঘোষ, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয় পরদিন অর্থাৎ ২৩ আগস্ট শিশির মঞ্চে। গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন শ্রীকান্ত আচার্য, বিভা সেনগুপ্ত। এছাড়া সেদিনের আকর্ষণ ছিল দিব্যেন্দু পালিতের তথ্যচিত্র 'দেবব্রত বিশ্বাস'। এ ছাড়াও আরও একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ইন্দ্রাণী সেন— "আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান"। কথায় ও সুরে ছিলেন বুদ্ধদেব গুহ, ঋতু গুহ, স্বপন গুপ্ত, শ্রীকান্ত আচার্য, শ্রাবণী সেন, প্রদীপ ঘোষ, শোভন সুন্দর বসু প্রমুখ।

দেবব্রত বিশ্বাস— সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এই মানুষটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। ময়মনসিংহের এক ব্রাহ্ম পরিবারে ১৯১১ সালের ২২ আগস্ট সালে কিশোরগঞ্জে তাঁর জন্ম। মায়ের মাধ্যমেই তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষার সূচনা। মহেন্দ্র রায়ের কাছে দেশাত্মবোধক গান শিখে কিশোরগঞ্জের সভায় গাইতেন। কলকাতায় এসে ম্যাট্রিক এবং পরে ১৯৩৩-এ এম. এ. পাশ করেন। জীবন বীমায় চাকুরী করতেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের সময় মহাজাতি সদনে বিদ্যার্থী পরিষদের ব্যানারে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের এক অনুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানের জন্য এই প্রতিবেদক চিত্তরঞ্জন এভেন্যুতে জীবনবীমার অফিসে গিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। বিনা

শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

দেবব্রত বিশ্বাস

পারিশ্রমিকে শিল্পী সেদিন বিদ্যার্থী পরিষদের সেই অনুষ্ঠানে এসে গান গেয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। বালীগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে একতলার একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে একা থাকতেন। রান্না করতে খুব ভালবাসতেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর উপাসনা। সঙ্গীতশিল্পী তো কতজনই হয়, কিন্তু গানকে জীবনের একমাত্র পরম সত্য জ্ঞানে কতজনই বা উপাসনা করেন? আর এখানেই দেবব্রত বিশ্বাস এক ব্যাতিক্রমী নাম।

১৯৩৮-এ শিল্পীর প্রথম রেকর্ড কনক দাসের সঙ্গে— 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' ও 'সংকোচেরও বিহ্বলতা' (জি ই ৮৬৬)। তারপর কলম্বিয়া এককভাবে পরপর তাঁকে দিয়ে বেশ কিছু রেকর্ড করায়। মাঝে কিছুদিন রেকর্ড করা বন্ধ থাকে। পরে আবার ১৯৬১ থেকে হিন্দুস্তান রেকর্ড কোম্পানী থেকে পরপর তাঁর রেকর্ড বের হতে থাকে। তাঁর গীত সবগানই অপূর্ব। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাব যেন তাঁর গায়েকীতেই বেশি দেখা যায় আজও। আমাদের হৃদয়ে সেইসব গান নাড়া দিয়ে যায়। এর মধ্যে 'আকাশ ভরা সূর্য তারা,' 'আমি চঞ্চ ল হে', 'তুমি রবে নীরবে', 'মেঘ বলেছে যাব যাব', 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। শেষোক্ত গানটি ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০)-য় তিনি গেয়েছেন। এছাড়া ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১)-এ তাঁর নেপথ্য সঙ্গীত স্মরণযোগ্য। বহুরূপীর হয়ে তিনি বহু জায়গায় নাটকে অভিনয় করেছেন। ১৯৪৯-এ তিনি বহুরূপীর হয়ে 'রক্তকরবী' নাটক পরিচালনা করেন। তিনি এই নাটকে বিশু পাগল সেজেছিলেন। পরে অবশ্য এই একই নাটক শম্ভু মিত্র পরিচালনা করেন। ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে একাধিকবার বিদেশ গেছেন। মুক্তি সংগ্রামের পর বাংলাদেশে তিনি প্রথম গান গাইতে গেছেন। দুপুর ১২ টার সময় রমনা ময়দানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে (কারণ অন্য সব সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি ব্যস্ত ছিলেন)। প্রখর রোদেও দুপুরবেলায় সেই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা চুপ করে বসে তাঁর গান শুনেছে। কলকাতায় দেখেছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র হারমোনিয়াম বাজিয়ে একের পর এক গান গেয়ে গেছেন। অন্য যন্ত্রসঙ্গীত দূরের কথা, তবলাও বাজতো না।

১৯৭১ থেকে তিনি আমৃত্যু আর কোনও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করেন নি। কারণ তাঁর সঙ্গে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের মত বিরোধ হয়। বোর্ডের কর্তাদের মতে দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর গানে অযথা বেশী যন্ত্রসঙ্গীত ব্যবহার করেন। ওয়েস্টার্ন মিউজিকের আধিক্য দেখা যায়। এই মতবিরোধের সময় তিনি একাধিক চিঠির মাধ্যমে মিউজিক বোর্ডকে তাঁর মতামত জানান। অনাদি দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেব ঘোষ তাঁর মতের সঙ্গে একমত হলেও সেদিন এই মতবিরোধে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে এঁরা কিছুই করতে পারেননি। ১৮ আগস্ট ১৯৮০-তে তিনি যখন ইহলোক ত্যাগ করছেন তখনও তিনি বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের কাছে ব্রাত্য'ই থেকে গেছেন। এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত'। '৭০ সালে শেষ রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করলেও আজও তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেস্ট সেলার।

শব্দরূপ - ৫৬৪

মলয় দাশ

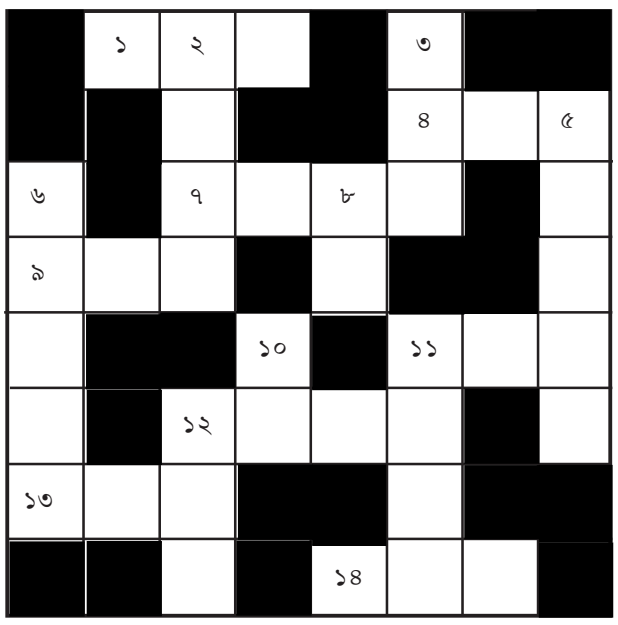

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. চৌষট্টি যোগিনীর মধ্যে প্রধানা যোগিনী, বিপরীতে ভৈরব, ৪. সন, ৭. প্রতিশব্দে দেরকো, পিলসুজ, দীপাধার, তিনে কাটারি, ৯. ইঙ্গ শব্দে ড্রয়ার, ১১. সাধনকারিণী, ১২. রাজা বাজশ্রবার পুত্র, এঁর অন্য নাম গৌতম, ১৩. ফারসি শব্দে প্রশস্ত, মুক্ত, ১৪. ব্রতাদি উদ্‌যাপনের পর ভোজনদ্বারা প্রথম উপবাস ভঙ্গকরণ।

উপর-নীচ ঃ ২. এরাই রোয়াকে বসে আড্ডা দেয়, ৩. বাতাসের অধিদেবতা, ৫. 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' গানটি যাঁর লেখা, পদবি সেন, ৬. স্থানিক পরিচয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের এক নাম, ৮. হিন্দি ভাষীদের কাজিয়া, প্রথম ঘরে কাটারি, ১০. বিশেষণে আসল, উৎকৃষ্ট, ১১. একটি সংখ্যা, দুয়ে-চারে ধাতু সূত্র, ১২. দৃষ্টি, লক্ষ্য।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৬২

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী

কলকাতা-৭০০০০৯

■	স	ব্য	সা	চী	■	■	দী
খ	না	■	■	ব	■	■	নে
■	ত	■	■	র	জ	নী	শ
স	ন	ক	■	■	টি	■	■
■	■	ল্যা	■	■	লা	চা	ডি
ত	রু	ণ	তা	■	■	রু	■
প	■	■	ড়	■	■	ম	নু
স্বী	■	■	স	ত্য	ব	তী	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৬৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০১০ সংখ্যায়

রঙ্গম

আসছে টেলিছবি— 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ'

মিতদ্রু দত্ত।। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবানুরাগীদের জন্য সুখবর। এবার স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম নিয়ে নির্মিত হচ্ছে অন্য ধারার টেলিছবি। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আসমুদ্রহিমাচলের অন্তরের অন্তঃস্থল। তাঁর হৃদয় যেমন ছিল কোমল, দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঠিক তেমনই সুদূরপ্রসারী। মানুষের দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত অথচ গুরুভাইদের কোনও অপরাধ চোখে পড়লে ক্ষমা মিলত না। আদর্শ ও নীতিতে এমনই বজ্র কঠিন মহাপুরুষ ছিলেন স্বামীজী। শিকাগোর ধর্ম মহাসম্মেলনে যিনি হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে তাবৎ বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আশ্চর্য এক যাদুস্পর্শে। এই মহান যুগপুরুষকে এবার ক্যামেরাবন্দি করেছেন পি. আর কমিউনিকেশনের সঞ্জীব চক্রবর্তী। তাঁর পরিচালনাতেই এবার আসছে টেলিছবি 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ'। বালক বিলে থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত এই মহাপুরুষের জীবনের নানা মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে এই টেলিছবিতে। পরিচালক জানিয়েছেন, স্বামীজীকে নিয়ে নিছক 'ছবি' করতে চাননি তিনি। এই মহান মনীষীর

জীবনাদর্শকে আজকের তরুণ প্রজন্মের সামনে সঠিক ভাবে উপস্থাপন করতেই তাঁর এই প্রয়াস। বিবেকানন্দের জীবনকে মোট তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে ছবিতে। আন্তর্জাতিক মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে গোটা ছবিটিতে। ভক্তিগীতির নামী শিল্পীদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত নরেন্দ্রপুর দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবনে স্বামীজীর বিভিন্ন যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তুলতে তাঁর চরিত্রে আছেন যাত্রা জগতের চেনা মুখ অরিন্দম রায়। অনিবার্য ভাবেই এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব (অভিনয়ে অনিল বসু) ও মা সারদা (অভিনয়ে অনুরাধা দে)-র কথাও। এছাড়াও গিরিশ ঘোষ, কেশব চন্দ্র সেনদের অবদান ও তদানীন্তন বাংলার নাট্য-আন্দোলনকেও তুলে ধরা হয়েছে এই টেলিছবিতে। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন হৈমন্তী শুক্লা, মান্না দে, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত (স্তোত্রপাঠ)। প্রায় তিন ঘণ্টার এই ছবিতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং কর্মের নানাদিক ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন সমসময়ের শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকরাও। তরুণ প্রজন্মের কথাও তুলে ধরা হয়েছে এতে। প্রযোজনার আর. পি. কমিউনিকেশন।

আধুনিক সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর মতো মনীষীকে বড় প্রয়োজন। তাঁর বাণী ও আদর্শই ভারতকে মুক্তির পথে চালিত করতে পারে। স্বামীজী বলেছিলেন, 'আমি নিজের মুক্তি চাই না, যতদিন পর্যন্ত এই ভারতের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমি মুক্তি চাই না, বার বার জন্মাতে চাই ভারতের এই পবিত্র ভূমিতে।' সেই মহান উক্তিটি দেখানো হচ্ছে ছবির শুরুতেই। টলিউডে যথেষ্ট সাড়া পড়ে গেছে ইতিমধ্যেই এ ছবিকে ঘিরে। মিলেছে দেশ-বিদেশের নানা মহলের প্রশংসাও। উল্লেখ্য, স্বামীজীকে নিয়ে পূর্ণ মাত্রার ছবি এই প্রথম। জানা গেছে, ছবির কাজ প্রায় শেষ। শীঘ্রই দেখা যাবে কলকাতা দূরদর্শনে। পরিচালকের কথায়, "শুধু এই মহান মানুষটির জীবনী নিয়ে ছবি করে পুরস্কার ও প্রশংসা কুড়াতে চাই না। এ কাজ করার মূল লক্ষ্য নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সামনে স্বামীজীর বাণী ও আদর্শ তুলে ধরা।" স্বামী বিবেকানন্দ রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও বিভিন্ন সম্পর্কিত বইপত্রের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে এ ছবি বানাতে বলে জানিয়েছেন পরিচালক স্বয়ং। বলাই যায়, এটি একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

সুকণ্ঠের সুআবৃত্তি, সুখানুভূতি

মিতদ্রু দত্ত।। সম্প্রতি জীবনানন্দ সভাঘরে চারুকৃতি আয়োজিত একক আবৃত্তি সন্ধ্যায় নিজেকে উজাড় করে দিলেন এই সময়ের প্রতিশ্রুতিবান আবৃত্তিশিল্পী পুলক রায়। দীর্ঘদিন তিনি আবৃত্তি চর্চার সঙ্গে যুক্ত। সতেজ সাবলীল কণ্ঠের পাশাপাশি স্পষ্ট উচ্চারণের কুশলী দক্ষতায় এক টানা কয়েক ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধ হলেন শ্রোতারা। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ থেকে সমসময়ের সুবোধ সরকার, শুভ দাশগুপ্তরা যেমন তাঁর নির্বাচনে হাজির তেমনি অতীতের স্মৃতি উসকে দিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অপ্রকাশিত রচনাও অবাক করে শ্রোতাদের। পুলকের ভাবনা আধুনিক। সফল আবৃত্তিশিল্পী হয়ে ওঠার জন্য যার বিশেষভাবে প্রয়োজন।

তবে একটি কথা বলাই যায় পুলকের বাচনভঙ্গিতে আরও পেশাদারিত্বেরে ছোঁয়া থাকলে সমগ্র অনুষ্ঠানটি হতে পারত সর্বাঙ্গ সুন্দর। মাঝে মাঝেই একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হতে হয়েছে আবৃত্তিপ্রেমী শ্রোতাদের— কখনও কখনও উচ্চস্বরগ্রাম পীড়া দিয়েছে তো কোনও কোনও কবিতায় উচ্চারণের (মাঝেমাঝে) অস্পষ্টতা কবিতার স্বাদগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে মোটের ওপর বলাই যায়, একক নিবেদনে পুলক রায় মোটামুটি পাশ।

তবে শ্রুতিশিল্পে সাফল্যের জন্য যে মনন, যে সৃজন ভাবনা ও দক্ষতার প্রয়োজন তা অর্জন করার প্রয়াস অব্যাহত রাখলে আগামীদিনে তাঁর থেকে আরও সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার পেতে পারবেন শ্রোতারা। এদিনের সন্ধ্যার পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কৃষ্ণপদ দাস ও সুস্মিতা দাস প্রশংসনীয়। চারুকৃতির এই সুআয়োজন তরুণ শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করাই যায়।

সূচপুর হত্যাকাণ্ডের রায় এবং তাৎপর্য

বিশাখা বিশ্বাস

নারকীয় এই হত্যাকাণ্ডের বিচারকে বারবার বিলম্বিত করার লক্ষ্যে 'শান্তির (এই বৌদ্ধিক) মরুদ্যানে' ভগবান 'তথাগতে' ভরসা রেখে এখানকার খুদে পলপটেরা যা করেছেন, পাঁচ লক্ষাধিক প্রতিবাদী মানুষের লাশকে সাইবেরিয়ার মাটিতে লুকিয়ে ফেলতে খোদ মহান স্ট্যালিনকেও তা করতে হয়নি!

প্রদোষকালের লাল সূর্য আঁধারের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে পুব আকাশে রঙ লাগাতে ব্যস্ত— তখুনি ওখানে নেমে এসেছিল বর্বর যুগের সেই ঘোর ঘনান্ধকার। সেই ঘনান্ধকারেই ভাঙাচোরা এক ক্লাবঘরের বারান্দায় চেঙ্গিজ খাঁ-য়ের বর্বরতা ধার করে এনে সদম্ভে তিনি বলছিলেন, "এক জনের মৃত্যুর জন্যে যা শাস্তি বাকী দশজনের মৃত্যুতেও সেই সমান শাস্তি, দাও...সবকটিকেই তাই শেষ করে দাও।" —দিনটা ছিল ২৭ জুলাই, ২০০০ সাল। বীরভূমের এই গ্রামটির নাম সূচপুর।

তারপর শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের বন্ধুরা এক এক করে সকলের চোখের সমুখেই এগারোজন তরতাজা কৃষি শ্রমিককে লাশ বানিয়ে দিয়েছিল শ্রমিক-কৃষক-সংগ্রামী মানুষের স্বার্থে! তারপর নারকীয় এই হত্যাকাণ্ডের বিচারকে বারবার বিলম্বিত করার লক্ষ্যে 'শান্তির (এই বৌদ্ধিক) মরুদ্যানে' ভগবান 'তথাগতে' ভরসা রেখে এখানকার খুদে পলপটেরা যা করেছেন, পাঁচ লক্ষাধিক প্রতিবাদী মানুষের লাশকে সাইবেরিয়ার মাটিতে লুকিয়ে ফেলতে খোদ মহান স্ট্যালিনকেও তা করতে হয়নি!

সূচপুর গণহত্যার একমাত্র জীবিত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী প্রাক্তন আর এস পি নেতা-কে তিনবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে, সে প্রচেষ্টা তিনবারই ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ সর্পিনীর দর্পিত হুঙ্কারে তারপর বারবার স্বগ্রামে স্বগৃহহারা সেই প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকে স্বগ্রামছাড়া করেছেন ক্ষুদে চেঙ্গেস্খর উত্তরসূরীরা। বারেবারে সেই সাক্ষীর ধোপা-নাপিত বন্ধ করা হয়েছে। তারপর তার ক্ষেতমজুর বয়কট করানো হয়েছে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে। সব অত্যাচারের ব্যর্থ প্রত্যাশা শেষে অবশেষে হের হিটলারের ক্ষুদে স্যাঙাতেরা সেই প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর দুই ছেলের চাকুরির প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে গেছেন প্রত্যক্ষদর্শী সেই প্রাক্তন আর এস পি সাক্ষী।

অত্যাচার ও চাপের রাজনীতি যখন বিফল হলো তখন এলো বিচারকে প্রলম্বিত করার কৌশল। সাক্ষ্যের দিন কোনও কোনও সাক্ষীকে ভয় দেখিয়ে প্রলোভিত করে আদালতে অনুপস্থিত রাখা হয়েছে। কোনওদিন সরকারী উকিলকে (একজন তো ডি এল আর ও-র সেক্রেটারী বলে শোনা গেছে), আবার কোনওদিন আই ও-কে আদালতে এ্যাবসেন্ট করানো হয়েছে। কোনওদিন এম সি সহ আবার কোনওদিন এ্যাবসেন্ট পিটিশান ছাড়াই আসামীদের গরহাজির করানো হয়েছে। এভাবে হাজারো 'শান্তির ললিত বাণী' পৌঁছে দিয়েছেন। চিঁড়ে তাতেও ভেজেনি। অতঃপর তার সামনে রাখা হয়েছে পাঁচ লক্ষ টাকার টোপ। তাতেও টলেননি সেই সাক্ষী— নির্লোভ, অকুতোভয়, শান্ত, দান্ত, জিতাত্মা ব্যক্তির মতো সিউড়ি দায়রা জজের উইটনেস-বক্সে দাঁড়িয়ে আকাশের জ্বলন্ত সূর্যকে সাক্ষী রেখে যা দেখেছিলেন তাই গড়গড় করে বলে

কৌশল ব্যর্থ হবার পর চিরকালের কৌশলপার্টির নেতাকর্মীদের বিচারে হলো অপরাধ সাব্যস্তকরণ এবং পরের দিনই সাজা ঘোষণার দিন পরিজ্ঞাপন। আদালত-কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে তখন ঘড়িগুলির নিঃশব্দ উচ্চারণ ঃ কই, বিচারের বাণী কই! বাইরে লক্ষ লক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হাত তখন শব্দে প্রতিধ্বনিতে গর্জে গর্জে উঠছে ঃ কই, বিচারের বাণী কই! হতাশায় বেদনায় বুকফাটা নিহতদের পরিবারগুলি বোবা যন্ত্রণায় যেন নিরুচ্চারে প্রার্থনা করছে ঃ আল্লা, এবার বিচার দে, আল্লা এবার বিচার দে!

তা বিচার হলো সেই সত্য যা ফাঁস করে দেয় ক্ষমতাধর বলদর্পী অত্যাচারীর সব অবিচারের চক্রান্ত, সব অত্যাচারের সকল কাহিনী। সেই বিচারই অবশেষে এল। জেনারেল ডায়ারের মলমূত্র সর্বাঙ্গে মেখে যে মহাপরাক্রমশালী ক্ষুদে হিটলারটি সূচপুরের ভাঙা ক্লাবঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মহাবিক্রমে হুকুম দিয়েছিলেন 'দে, সব কটিকেই শেষ করে দে'— সেই বীরবিক্রমী বেতাজ বেতমিজ-টি সিউড়ির জেলা আদালতের কক্ষাভ্যন্তরে প্রিজনভ্যানে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে মুখে ঘোলাটে চোখে ভাবলেশহীন মৃত মানুষের মুখের মতো মুখকে সামনে তুলে ধরে বললেন ঃ হুজুর, বাড়ীর আমিই একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি...আমার বাড়ীতে স্ত্রী চিররুগ্না, আমি নির্দোষ হুজুর!...

ধীর অকম্পিত কণ্ঠে বিচারক শাস্তির বয়ান শোনালেন। অন্যান্য আনুষঙ্গিক শাস্তির পাশাপাশি নির্মম হত্যাকাণ্ডের জন্যে আসামীদের মাত্র চুয়াল্লিশজনকে ভোগ করতেই হবে যাবজ্জীবনের জন্যে কারাবাস। সেদিন ১২ নভেম্বর ২০১০ সাল।...

সূচপুরের ঘাতকেরা শাস্তি পেয়েছে— কিন্তু পদতল মরুভূমির মতো রিক্ত, শূন্য কী হবে না কোন সেন বা বোসেদের (সাঁইবাড়ী)? বিচার কী হবে না সেই সব পুলিশ আর পুলিশের পোশাক পরা দলীয় হার্মাদদের— যারা সুন্দরবনে কয়েকশ' কুমারীর ইজ্জতনাশের শেষে কয়েক হাজার মানুষকে লঞ্চে তুলে ডুবিয়ে দিয়েছিল মাঝ নদীতেই (মরিচঝাঁপি)? কলকাতায় দিনদুপুরে কেরোসিন, পেট্রোল গায়ে ঢেলে যে আঠারোজন সন্ন্যাসীকে সেদিন পুড়িয়ে মেরে রাজপথে ফেলে রাখা হলো— সেই সব সন্ন্যাসীর আত্মারা কী বিচার পাবে না (বিজনসেতু হত্যাকাণ্ড)? আর্ত-মানুষের সেবায় ওষুধ নিয়ে যাবার সময় ঘাতক-হার্মাদদের কাছে নারীত্ব ও প্রাণ বলি দিয়ে গেলেন যারা, তারা কী পাবেন না বিচারের শীতল বাতাস (বানতলা)?

বিচারের বাণী কি নীরবেই কেবল কেঁদে কেঁদে ফিরে যাবে কলকাতা বন্দরের সেই বধ্যভূমিতে যেখানে নিহত হয়েছিলেন সেই ছয়জন আন্দোলনকারী শ্রমিক (বন্দর)? কলকাতা রাজপথের সেই ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীর অমর আত্মারা, ছোট আঙারিয়ার সেই বক্তারের বাড়ীর ১৭টি জীবন, এবং সাম্প্রতিক সময়ের সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম দিনহাটার শতশত ধর্ষিতা নিহত মানব-মানবীর অমর আত্মারা যারা পুলিশ-প্রশাসন ও উর্দিপরা হার্মাদদের মাথা লক্ষ্য করে কেবল থুথু ছিটিয়ে চলেছেন তারাও কি রেহাই পেয়ে যাবেন বিচারের চাবুক থেকে? নাকি সূচপুর-রায়ের পর আগুনের স্ফুলিঙ্গ চোখে নিয়ে বিচারের বাণী কৌশলপার্টির জেলাপরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও মেম্বার নিত্য চ্যাটার্জী, জেলা কমিটির বর্তমান সদস্য রাম ঘোষ, জোনাল কমিটির সদস্য নানুরের গোলাম সারওয়ার, লোকাল কমিটির দাপুটে সদস্য মোহন সেখদের মতো ঘাতকদের সাজার পর এবার ওইসব অত্যাচারীর পেছনেও ধাওয়া করবে?

— কেবল ইতিহাসই জানে তার জবাব!...

(এই মামলায় সাজাদানকারী বিচারকের নাম শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কোনার)

ক্যামেরার সামনে কাসভের থুতু ছেটানো আসলে ভারতবাসীর মুখেই নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ

শিবাজী গুপ্ত

খবরে প্রকাশ মুম্বাই বিস্ফোরণের পাণ্ডা আজমল আমির কাসভ বোম্বে হাইকোর্টে তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানী কালে ক্যামেরার দিকে থুতু ছিটিয়ে নাটক করেছে।

বিধর্মী বিজাতি এবং ভারতবিদ্বেষী হয়েও কারাবন্দী কাসভ যে কাজটি করেছে তার তারিফ করতেই হয়। কাসভের এই থুতুক্কার শুধু নিষ্প্রাণ ক্যামেরার দিকে ভাবলে ভুল করা হবে। প্রায় তিন বছর ধরে পাকিস্তানী খুনী জল্লাদ কাসভের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে যে প্রহসন চলছে, একটা জঘন্য অপরাধে অপরাধী শত শত নিরীহ নরনারী শিশুর হত্যাকারীকে আইনের শাসনের অজুহাতে যেভাবে নবাবী কায়দায় তোষণ- পোষণ চলছে, জলের মতো কোটি কোটি টাকা তার পেছনে খরচ করা হচ্ছে তাতে লজ্জায় ভারতবাসীর মাথা কাটা যাচ্ছে। ধিক্কার ছিছিক্কারে পথে-ঘাটে কানপাতা দায়। সশস্ত্র মুসলীম সন্ত্রাসের শিকার বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাগ্রত জনমত ভারত সরকারের নির্লজ্জ নির্বীর্য ভূমিকার ঢিঢিক্কার করছে।

চোর, ডাকাত, খুনী, লোচ্চা মুসলমানও তার জাত-ভাইদের কাছে আদর্শ পুরুষ। এদের আইনের বিচারে এদের কুকর্মের শাস্তি হলে মুসলমানদের বুক ফেটে যায়। হিন্দু ও হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধকেই তারা অপরাধ মনে করে না— কারণ সে অপরাধ কোরানের নির্দেশ মতোই করা হয়েছে। এদের দুষ্কর্মের বিচার করায় অধিকার আদালতের আছে বলে তারা মনে করে না। কারণ বিধর্মী-বিরোধী কোনও দুষ্কর্মের জন্যই তাদের খোদার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।

কাসভ ক্যামেরার দিকে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করেছে প্রকাশ্য আদালতে— কারও তো গায়ে লাগেনি— এ নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ মূঢ়তার পরিচয়। এবং "কান মলেছে, নাক খত দিয়েছে, জুতাপেটা করেছে, কিন্তু অপমান করেনি" বলে সান্ত্বনা লাভের মতো মান-অপমানবোধহীন জড়বুদ্ধির আত্মতৃপ্তির সমতুল।

কিন্তু স্বাভিমানী ভারতবাসী মাত্রই মনে করে খুনী কাসভের এই থুতু ভারতের বিচার ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্র পরিচালনা ও পরিচালকদের মুখেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সে জানে দুই শতাধিক হিন্দুর প্রাণ কেড়ে নিলেও এবং শতশত কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট করলেও তাকে শাস্তি দেবার হিম্মৎ ভারত সরকারের নেই। কাশ্মীরী-জঙ্গী সংসদ ভবন আক্রমণকারীকে সুপ্রীম কোর্টের রায় মেনে ফাঁসিতে না লটকিয়ে গোস্ত-বিরিয়ানি খাইয়ে পুষ্ট-তুষ্ট-করা হচ্ছে। ফাঁসিতে না ঝুলে, সে নিজেই ভারত সরকারের গলায় ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনও অজুহাতে তাকে খালাস করে দেবার জন্য সরকার হাঁসফাঁস করছে। মাঝেমাঝে মনে হয়, সংসদ ভবন আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা বৃথাই তাঁদের জীবন বিসর্জন দিলেন, তাদের স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের অকালে অনাথ করে গেলেন। তাদের এই আত্মদান নিষ্ফল ও নিরর্থক হয়ে রইল। তার চেয়ে সন্ত্রাসীরা পার্লামেন্ট ভবনে ঢুকে কিছু নপুংসক রাজনীতিককে খতম করে গেলে প্রতিক্রিয়ায় দেশের ক্ষাত্রশক্তি হয়তো জেগে উঠত।

কাসভের এই থুতুক্কার শুধু ক্যামেরার ওপর নয়, শতকোটি ভেড়ার পাল সদৃশ ভারতবাসীর মুখেই ছিটিয়ে গেছে। তা না হলে, অন্য কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হলে তাকে কাঠগড়া থেকে টেনে নিয়েই ছিঁড়ে

ফেলত। হিন্দু-ব্রাহ্মণ পুলিশ স্বহস্তে দেশের ও জাতির শত্রুকে গোস্ত-বিরিয়ানি পরিবেশনের পরিবর্তে ট্রিগার টিপে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিত।

দেশে তো চলছে প্রমীলার রাজত্ব। রাষ্ট্রপতি ভবন আলো করে আছেন এক মহিলা, সংসদ ভবনে স্পীকারের আসন দখল করে আছে এক নিস্তেজ মহিলা, প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে আছেন এক পরমুখাপেক্ষী মনোমোহিনী (পুং), আর তাদের সবাইকে আড়াল করে আড়াল থেকে দেশশাসন করে যাচ্ছে এক বিদেশী মহিলা। তিনি ক্ষমতায় না থেকেও সর্বশক্তি স্বরূপিণী। তার অঙ্গুলিহেলনে দেশ চলছে অথচ তার লেজে (এপ্রনে) হাত দেবার কোনও পথ নেই। কারণ, তিনি কোনও সরকারি পদে নেই। আর এই নিষ্কর্মা গোষ্ঠীকে সমালোচনা করারও নেই কোনও উপায়। প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করলে মারাঠীরা ক্ষুব্ধ হবে, প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করলে শিখরা অসন্তুষ্ট হবে, স্পীকারের সমালোচনা করলে তফশিলী ও মহিলারা ব্যথা পাবে— আর যিনি কোনও পদে না থেকেও দেশের বিপদের কারণ হয়ে উঠেছেন তিনি তো তার সন্তানটিকে প্রধানমন্ত্রী বানাবার জন্য 'তা' দিতেই ব্যস্ত। দেশ হাজার সমস্যায় ডুবছে, আর প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন পরপরই একদঙ্গল চাটুকার সাংবাদিক নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

দেশের এই অভিভাবকহীন অবস্থা দেখেই কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানী খাস দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবন, প্রধানমন্ত্রী ভবন ও সাংসদ ভবন এবং সর্বোচ্চ আদালত ভবনের সামনে বসে বিচ্ছিন্নতাবাদের ঢ্যাড়া পিটিয়ে ও ধ্বজা উড়িয়ে গেলেন এবং মেয়ে-মুখো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাক্-স্বাধীনতার নীতি আউড়ে গিলানীর মুখ থেকে নির্গত থুতু-গয়ের গিলে ফেললেন। মনে হয় মুসলমান রাজত্বকালে নবাব-বাদশা-সুলতানদের হারেম পাহারা দেবার জন্য যত খোজা প্রহরী ছিল, তাদের মামদোগুলিই সেকুলার রূপ ধারণ করে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার ভার পেয়েছে। তা না হলে এসব নির্বীর্য-জীব কোথেকে পয়দা হয়েছে?

Swastika
29 November - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

মহাজাতি সদনে 'যোগক্ষেম'-এর উদ্যোগে আলোচনা সভার রায়

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা : স্বদেশানুরাগের-ই পরিচয়

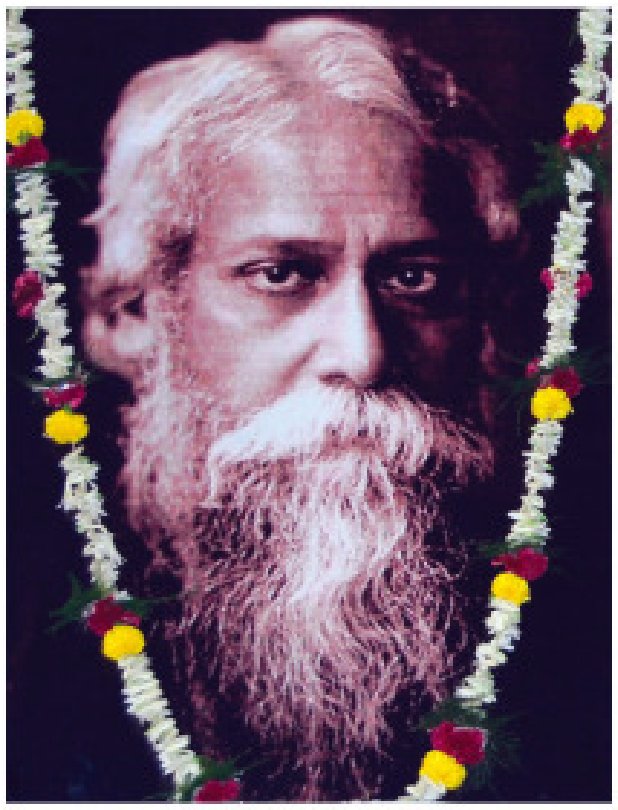

নিজস্ব প্রতিনিধি।। "আজকের আলোচনাসভার বিষয়— রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ ভাবনা'। এই স্বদেশ ভাবনা ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য যা রামায়ণে মর্যাদাপুরুষোত্তম রামচন্দ্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে— 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। এখানে জননী ও জন্মভূমি একাত্ম। আমরা সবাই জানি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন— তাই বলে বন্দেমাতরমে সুর দিতে বা গাইতে তিনি সঙ্কোচবোধ করেননি। ত্বং হি দুর্গা.....। ১৮৯৬-এ কংগ্রেস দলের অধিবেশনে তিনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বিরচিত সম্পূর্ণ 'বন্দেমাতরম্' গেয়েছেন নিঃসঙ্কোচে। এটা তাঁর গভীর স্বদেশানুরাগেরই পরিচয়।" উপরের কথাগুলি বলেন সাপ্তাহিক স্বস্তিকা'র অন্যতম ট্রাস্টি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের প্রাক্তন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী। তিনি কলকাতার একটি পুরাতন সাংস্কৃতিক সংস্থা 'যোগক্ষেম'-এর উদ্যোগে মহাজাতি সদন সভাগারে (অ্যানেক্স)-এ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় গত ২০ নভেম্বর বক্তব্য রাখছিলেন।

শ্রীচক্রবর্তী আরও বলেন, প্রকৃত ভারতবর্ষ মানে গ্রাম ও গ্রামের জনতা। সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এক অভিজাত ও ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে দীর্ঘদিন কাটানোর পরও শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন যেখানে তখন ছিল না বিদ্যুৎ, এমনকী পানীয় জলও ছিল না। সেখানে তখন পাকাবাড়ি নেই, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ নেই। তবুও তিনি নিজে বসবাস করে প্রতিষ্ঠা করেছেন আশ্রমিক পরিবেশ, প্রাচীন ভারতের গুরুকুল শিক্ষার অনুকরণে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে সকালে ধুতি পরে বেদ-উপনিষদের মন্ত্রপাঠ হোত। সৈয়দ মুজতবা আলি ১৯২১ সালে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আশ্রমিক পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ হৃদয় দিয়ে ভারত-আত্মাকে অনুভব করেছেন। 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'নেশন' প্রসঙ্গে বলে গিয়েছেন। 'জাতি' অর্থে জাত বোঝায় বলে তিনি 'নেশন' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

শ্রীচক্রবর্তী বলেন, এদেশের ব্রাহ্ম, খৃস্টান, মুসলমান-সকলেই হিন্দু। কেউ হিন্দু ব্রাহ্ম, কেউ হিন্দু 'খৃস্টান', কেউ হিন্দু মুসলমান। উপাসনা পদ্ধতি যার যাই হোক না কেন; পিতামাতা, পূর্বপুরুষের পরিচয় কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। এদেশের সেই পরিচয় হলো হিন্দু; হিন্দুত্ব। প্রথমে হিন্দু পরে অন্য যা কিছু। এটাই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার মূল কথা।

এখনকার গ্রীস, ইজিপ্ট, পেরু, মেক্সিকো তাদের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারেনি। ভারত পেরেছে। ইংরেজ শাসনে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা, মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে পাকাপোক্ত হয়েছে। এদেশে প্রাচীনকালে ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব থাকলেও তীর্থভ্রমণ দেশজুড়ে ছিল। ইউরোপে নেশন-স্টেট সরকার আশ্রিত, এদেশে সমাজ আশ্রিত, ধর্মাশ্রিত বা ইনক্লুসিভ। যে কারণে বেদকে অপৌরুষেয় না মেনেও বুদ্ধদেব দশাবতারের মধ্যে গণ্য। রবীন্দ্র-চিন্তাকে আশ্রয় করে স্বদেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

শ্রীচক্রবর্তী ছিলেন আলোচনাসভার সর্বশেষ বক্তা। তাঁর আগে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ শানু লাহিড়ী। শ্রী চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের হিন্দুমেলার গান, অন্যান্য দেশভক্তিমূলক গান ও রচনার মধ্যে যে স্বদেশ ভাবনা জারিত হয়েছে তা তুলে ধরেন।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে আলোচনা সভার উদ্বোধন করছেন ডঃ শানু লাহিড়ী।

ডঃ শানু লাহিড়ী বিস্তৃতভাবে রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের কথা বলেন। দীপ প্রজ্জ্বলন করে ডঃ শানু লাহিড়ী সভার সূত্রপাত করেন। তিনজন বক্তাকেই আয়োজকদের পক্ষ থেকে অঙ্গবস্ত্র দিয়ে বরণ করা হয়। শেষে ধন্যবাদ জানান যুগ্ম আহ্বায়ক নির্মাল্য ভট্টাচার্য। সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপক রবি রঞ্জন সেন।

প্রকাশিত হবে ১৩ ডিসেম্বর, '১০
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ১৩ ডিসেম্বর, '১০
বিশেষ প্রসঙ্গ : কাশ্মীর
কাশ্মীরে সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, অশান্তির মূলে ৩৭০ ধারা, আন্তর্জাতিক পাশাখেলা (ষড়যন্ত্র), জঙ্গি নাশকতা, গৃহহারা কাশ্মীরী পণ্ডিতরা, জম্মুতে হিন্দুদের উত্তাল আন্দোলন—এমনই সব বিষয় আর বিশ্লেষণে ঠাসা, তথ্যসমৃদ্ধে ভরপুর, সংগ্রহযোগ্য একটি সংখ্যা।
।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ পাঁচ টাকা।।

'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা' শীর্ষক আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখছেন জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম এর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৪০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com